# পরিচয়

পঞ্চদশ বর্ষ—১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৫২



## কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে

১৯২৮ সালের মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি। তার কয়েকদিন আগেই বিশ্বভারতীর তরফ থেকে খুব ঘটা ক'রে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করা হয়েছে জোড়াসাঁকোতে। সেইবার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী দিয়ে তুলাদান করা হোলো। বেশ মনে আছে লালবাড়ির ( বিচিত্রা ভবন ) দক্ষিণের বারান্দায় প্রকাণ্ড একটা তুলাদণ্ডের উপর একদিকে বসে কবি আর অন্যদিকে রাশকরা ওঁর গ্রন্থাবলী। সেইসব বই পরে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে নানা লাইব্রেরীতে দান করা হোলো।

সেইবারই অল্প কয়েকদিন আগে "একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি", "মরি হায় চলে যায় বসন্তেরি দিন", "হে মাধবী দ্বিধা কেন" প্রভৃতি গানগুলি রচনা করেছিলেন, আর ২৫শে বৈশাখ অনেকে মিলে সেই সব নতুন গান আমরা গেয়েছিলাম। কবি নিজেই এইসব টাটকা লেখা গান আমাদের শিখিয়েছিলেন। প্রতিদিন দুটো তিনটে ক'রে গান অমিতাকে ( অমিতা ঠাকুর), আমাকে আরো অনেককে যাদের হাতের কাছে পাচ্ছেন তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিচ্ছেন, পাছে দেরী হ'লে নিজে ভুলে যান।

দীনুবাবু অনেক সময় অনুযোগ ক'রে বলতেন, "রবিদা; তুমি একই গান দু-তিন রকম সুরে শেখাও। ভুল ধরলে লোকে বলে স্বয়ং কবির কাছে শিখেছি।" উনি হেসে উত্তর দিতেন, "জানিস্, ওরা হয়তো নিজেরাই ভুলে গিয়ে অন্য সুরে গায় আর আমার 'পরে দোষ চাপায়। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর একটুও বিশ্বাস নেই বলে আমিও প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনে। আর তাছাড়া আমার নিজেরই তো দেওয়া সুর, কাজেই আর একটা নতুন সুর দিলুমই বা। এক তুই ছাড়া তো আর কেউ কৈফিয়ৎ তলব করবে না?" এর পরে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠ্তেন—ভুল সুরের ঝগড়া থেমে যেতো।

কবি অনেক সময় দীনুবাবুর সামনেই বল্তেন, "নতুন গান সম্বন্ধে হলফ ক'রে যদিও কিছু বল্তে পারিনে কারণ আজ শিখিয়ে কাল ভুলে যাই। তারপর তোমরা যখন কেউ গাও হঠাৎ মনে হয়, বাঃ, লোকটা বেশ গান লিখেছিলো তো! কিন্তু মজা হ'চ্ছে যে, আমার কম বয়সে লেখা গানগুলোর সুর আমি ভুলিনি—সবগুলো গানের কথা ও সুর আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাই দীনুবাবুর সঙ্গে সেসব গান নিয়ে যদি ঝুটোপুটি বাধে তো আমি কিছুতেই ওঁর কাছে হার মানিনে—বলি, 'তুই বিবিকে ( ইন্দিরা দেবী ) জিজ্ঞাসা করিস—ঐ হোলো

আমার আর এক অথরিটি—দেখ্‌বি আমার উপর অবিচার করছিস্।' দীনদা যতোই হাসুন উনিও আজকাল আমার মতো একটু একটু ভুল্‌তে শুরু করেছেন। তবে ওঁর হাতে অস্ত্র আছে, উনি স্বরলিপি ক'রে নিজের ভুলটাকে পাকা ক'রে ফেলেন, তখন দশজনের কাছে আমাকেই চুপ ক'রে যেতে হয়। ঐ "শ্রাবণ বরিষণ পার হ'য়ে কি বাণী" গানটা স্পষ্ট মনে আছে বেহাগে সুর বসিয়েছি, আর শুনি মেয়েরা গাইছে মল্লারে। আমি আপত্তি করাতে বোল্‌লো—'বাঃ, পশু দিন দীনদার গানের ক্লাসে শিখেছি। দীনদা ভুল সুর শিখিয়েছেন এ হ'তেই পারে না; আপনিই ভুলে গেছেন।' হায়রে আমার শনিগ্রহ! গানে যে হতভাগ্য সুর বসিয়েছে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ওরা কিছুতেই সে আপত্তি মানলে না, কারণ 'দীনদার' কাছে যে শিখেছে। আমার কবির খেয়ালের চেয়ে 'দীনদার' উপর অনেক বেশি ভরসা। আরে একথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন যে, দীনদাও কবি কম নয়। তবু যতো অবিশ্বাস আমারই 'পরে? আসলে দীনু অনেক দিন ধরে নিজের একটা রেপুটেশ্যন্ খাড়া ক'রে নিয়েছে, কাজেই এখন আর ওর ভয় নেই। আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমাতে ও জিত্‌বেই জিতবে; অতএব কী হবে ঝগড়া ক'রে?" এইসব কথাতে দীনুবাবুর সে কি প্রাণখোলা হাসি।

সেইসব হাসিঠাট্টার দিনগুলো এখন যেন রঙীন স্বপ্নের মতো মনে হয়। দীনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের হাসিঠাট্টা, উত্তর প্রত্যুত্তর যাদের শোন্‌বার সৌভাগ্য ঘটেছিলো বরাবরের মতো তাদের মনের মণিকোঠায় তা সঞ্চিত হ'য়ে রইলো।

যে কথাটা গোড়ায় বল্‌তে শুরু করেছিলাম: ১৯২৮-সালের গ্রীষ্মকালে রথীবাবু খুব অসুস্থ, কবিরও শরীর ভালো নয়। স্থির হোলো ওঁরা সবাই সেবারে বিলেত যাবেন। জাহাজের তখনও মাস খানেক দেরী। তাই প্রতিমাদি'রা ক'লকাতায় অপেক্ষা না ক'রে কোডাইক্যানেলে চলে গেছেন যাতে, কবি ক'লকাতা থেকে জাহাজে রওনা হ'লে ওঁরা মাদ্রাজ অথবা কলম্বোতে এসে ওঁর সঙ্গে মিল্‌তে পারেন।

কবির যাওয়ার সমস্ত ঠিক—পরদিন খিদিরপুর ডক্ থেকে জাহাজ ছাড়বে। জিনিসপত্র গোছানো শেষ হয়েছে। সুরেনবাবু (সুরেন কর) মিঃ আরিয়াম ও এণ্ড্রুজ সাহেব রয়েছেন জোড়াসাঁকোতে কবির সঙ্গী। মিঃ আরিয়াম ও এণ্ড্রুজ সাহেব কবির সঙ্গে বিলেত যাচ্ছেন, আর সুরেনবাবু এসেছেন গোছগাছ ক'রে ওঁকে রওনা ক'রে দিতে।

এণ্ড্রুজ সাহেব জাহাজ ঠিক ক'রে এসে বল্লেন, "গুরুদেবের এ ষ্টিমারে যেতে কিছু কষ্ট হবে না, আরামেই যাবেন। ঘরটা ভালো পাওয়া গেছে।"

কবির অভ্যাসের সঙ্গে যাদের কিছু পরিচয় ছিলো তারা সকলেই জান্‌তো ঠিক শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা স্নানের ঘর না থাক্‌লে ওঁর কিরকম অসুবিধা হয়। এণ্ড্রুজ সাহেবের এসব বিষয়ে যে কোনো খেয়াল্ নেই তাও সকলেই জানে। কাজেই আমরা সবাই মিলে সাহেবকে প্রশ্ন করতে লাগ্‌লাম যে, কবি আলাদা একটা স্নানের ঘর নিজের জন্যে পাবেন কিনা। সাহেব ঠিকমতো জবাব দিতে পার্‌লেন না। সুরেনবাবুর রাত্রেই জিনিসপত্র জাহাজে তুলে দিয়ে আসবার কথা। আমার স্বামী পরামর্শ দিলেন যে, জিনিস নিয়ে যাবার আগে নিজের চোখে একবার দেখে আসা ভালো কি রকম কি ব্যবস্থা। নইলে শুধু এণ্ড্রুজ সাহেবের কাণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করলে শেষে মুস্কিল হ'তে পারে। সুরেনবাবু খিদিরপুর চলে গেলেন সরে জমীন্ তদন্ত করতে।

আমরা সবাই তখনও জোড়াসাঁকোতে বসে আছি; রাত প্রায় ৯॥০ টা হবে। স্থরেনবাবু ফিরে এসে বল্লেন, "এ জাহাজে গুরুদেবের যাওয়া অসম্ভব। উনি যেতলায় থাকবেন তার নিচের তলায় স্নানের ঘর—প্রত্যেকবার ওঁকে সিঁড়ি ভেঙে যেতে হবে।" কবির অন্তিম-কালের অস্থখের স্থচনা তখন থেকেই শুরু হয়েছে, শরীরও বেশ অস্থস্থ, কাজেই দূরে স্নানের ঘর হ'লে ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

কবি সব শুনে বল্লেন, "ঐ জাহাজে এণ্ড্রুজ ও আরিয়াম সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান, আমি তুদিন পরে ট্রেনে ক'রে গেলেও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজ পৌঁছতে পারবো।" কবির কথামতো ওঁরা তুজন চলে গেলেন।

পরদিন সকালে যখন জোড়াসাঁকোতো গিয়েছি কবি বল্লেন, "রানী, চলো তোমরা তুজনে আমাকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্বে। বহুদিন তো পথে পথে তুজনে আমার অভিভাবকের কাজ করেছো, আর একবারও না হয় করবে।"

প্রেসিডেন্সী কলেজের তখন গ্রীষ্মের ছুটি, কাজেই আমাদের সেইদিনই মাদ্রাজ মেলে কবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে কোনো বাধা হোলো না। আমরা স্থির করলাম কবিকে এক-সপ্তাহ পরে মাদ্রাজ থেকে বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়ে সারা ছুটিটা দক্ষিণ দেশেই বেড়িয়ে বেড়াবো।

অসহ্য গরমের মধ্যে তিনজনে যাত্রা করা গেলে। মাদ্রাজে পৌঁছে দেখি আরিয়াম ও এণ্ড্রুজ তুজনেই স্টেশনে হাজির। শুন্লাম মিসেস্ বেসেন্ট আডিয়ারে থাকবার জন্যে কবিকে নিমন্ত্রণ করেছেন; তাই আমরা সকলে সেখানে গিয়েই উঠ্লাম।

ব্ল্যাভাট্স্কি হাউস্ মস্ত বাড়ি, দোতলায় কবি ও আমাদের তুজনের জায়গা, ও একতলায় সাহেবের স্থান হোঁলো। আরিয়াম্ বোধ হয় আর কোনো একটা জায়গায় ছিলেন—ঠিক মনে নেই।

মিসেস্ বেসেন্টের আতিথ্যে আয়োজনের কোনো অভাব ছিলো না, অভাব শুধু বিজ্লী পাখার। অথচ মাদ্রাজে গ্রীষ্মকালে ঐ জিনিসটির অভাব ঘট্লে কী শোচনীয় অবস্থা হয় তা অনুমান করা শক্ত। ওদেশে অনেকের একটা মজার ধারণা আছে যে, পাখার বাতাসে নিউ-মোনিয়া হবার ভয়, তাই বোধ হয় অতিথশালায় এই সতর্কতা। যাই হোক, কবির কষ্ট দেখে এণ্ড্রুজ সাহেব কোথা থেকে ছোট্টো একটা টেব্ল্ফ্যান্ যোগাড় ক'রে আন্লেন।

বাড়িটার সামনে চওড়া বারান্দা আর তার সামনেই দূরে নীল সমুদ্র—ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সেই চওড়া বারান্দাতেই সারাদিন আমাদের শোওয়া বসা খাওয়ার ব্যবস্থা হোলো। গরমে ঘরে ঢোকে সাধ্য কার?

বারান্দায় রাত্রে পর পর তিনখানা খাট পড়লো। কবির খাটের পাশে সেই ছোট্ট পাখাটাকে এমন হিসেব ক'রে রাখা হোলো যাতে ওঁর খাট ছাড়াও আরো তুখানা খাটে কিছু কিছু হাওয়া গিয়ে পৌঁছয়।

বরাবর দেখেছি কাছে যে কেউ থাকতো তার স্থবিধার জন্যেই কবি ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন। মাদ্রাজ মেলে যাবার সময় গরমের মধ্যে বারবার বলেছেন "রানী, তোমাদের দিকে পাখাটা ভালো ক'রে ঘুরিয়ে নাও; কিছু অস্থবিধা হবে না আমার। আমি জানি যে বৈজ্ঞানিকের পাখা না হ'লে কষ্ট হয়। আমার শান্তিনিকেতনে থেকে গরম

সহ্য করা অভ্যাস আছে।" মাদ্রাজে তাই ছোট্ট পাখাটা যখন এলো তখনও ওঁর বিছানার কাছে সেটা রাখতে মহা আপত্তি। শেষকালে আমার স্বামী যখন বল্‌লেন, "আমাকে তো ম্যাথামেটিসিয়ান্ বলেন? দেখুন, আমি হিসেব ক'রে এমন এ্যাংগেলে রাখবো পাখাটা যে, তিনজনেই ঠিক বাতাস পাবো।" নানারকম হিসেব ক'রে খাট তিনখানা যখন সাজানো হোলো আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কবি হেসে বল্লেন, "একেই বলে সায়ানটিস্ট।"

আমরা পৌঁছবার পরে সন্ধ্যেবেলা বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছতলায় সমস্ত আশ্রমের অধিবাসীদের নিয়ে মিসেস্ বেসেণ্ট কবির সম্বর্দ্ধনা করলেন। মিসেস্ বেসেণ্টের সেদিনকার বক্তৃতা কবিকে খুব স্পর্শ করেছিলো। অত অসুস্থ শরীর নিয়েও তাই ধন্যবাদ দিতে উঠে যা বললেন সে পুরো বক্তৃতার চেয়ে কম নয়। আশ্রমবাসী সকলেরই মন মুগ্ধ হোলো।

অত অসুস্থ শরীর তার উপর অসহ্য মাদ্রাজী গরম না হ'লে কবি আডিয়ারে বেশ আনন্দেই থাকতেন। কারণ বাড়িটার কথা তো আগেই বলেছি—চমৎকার প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দায় বসে দিনরাত সমুদ্র দেখা যায়, বড় বড় গাছের ছায়া, ঘন বাগান, ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অসংখ্য রকম পাখীর ডাক, নির্জ্জন শান্তিতে ভরা চারিদিক—এইরকম পরিবেশের জন্যেই তো চিরদিন ওঁর মন ব্যাকুল হোতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাদ্রাজে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। স্থানীয় একজন ডাক্তারকে দিয়ে তখন কবির চিকিৎসাও চলছে ultra violet আলোর। প্রতিদিন আলো নেবার ফলে বিশেষ যে কিছু উন্নতি হয়েছিলো তা মনে হয় না, তবে বোধ হয় পায়ের ফোলাটা সামান্য একটু কমেছিলো—অন্তত ডাক্তার তাই মনে করেছিলেন।

সেইবারই আডিয়ারে তিনটি মেয়ে একদিন কবির সঙ্গে দেখা করতে এলো—এরা তিন বোন। কাশীতে থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেয়েদের ইস্কুলের ছাত্রী। এদের মধ্যে কেউ গান জানে কিনা জিজ্ঞাসা করায় একটি মেয়ে কবিকে গান শোনালো। তার গলা শুনে কবি মুগ্ধ। উৎসাহিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃত্তি দিয়ে তাকে নিয়ে গেলে সে শান্তিনিকেতন যেতে রাজী আছে কিনা। সে তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলো, কারণ শান্তিনিকেতন যাবার ইচ্ছে নিয়েই কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো এবং এই অর্থের অনটনই প্রধান অন্তরায়। এই মেয়েটি শান্তিনিকেতনে আসার অল্প দিনের মধ্যেই এমন চমৎকার বাংলা শিখলো যে ওর মুখে কবির গান শুনে কেউ ধরতে পারলো না যে, সে বাঙালী নয়। সেইবার বর্ষামঙ্গল উৎসবে এম্প্যায়ার থিয়েটারে সাবিত্রী যখন "তুমি কিছু দিয়ে যাও" "শুভ্র প্রভাতে" প্রভৃতি গানগুলি একা গাইলো সকলে স্তম্ভিত। মাদ্রাজী মেয়ের মুখে এমন স্পষ্ট বাংলা গান তো কেউ শোনেনি। গানের কথা ও সুর যেমন অপূর্ব্ব, সাবিত্রীর গলাও তেমনি অসাধারণ। তখনকার দিনে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকতো না—যারা গাইতো তাদের নিজেদের গলাই ছিলো সম্বল। সাবিত্রীর ভগবান-দত্ত গলা দীনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় যে কী অপূর্ব্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল—তা যারা শুনেছে তারাই মনে রাখবে।

এক সপ্তাহ দুঃখ ভোগের পর গরম যখন অসহ্য বোধ হ'চ্ছে তখন হঠাৎ একদিন সকালে

সাহেব খুব উৎসাহিতভাবে একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে কবির কাছে এসে হাজির—"Gurudev, here is telegram from the Maharaja of Pithapuram. He has gone up to Coonoor and invites you to go there to spend a few days with him before you leave for Europe.

অপ্রত্যাশিত এই খবর! গরমের থেকে কয়েকদিনের জন্যেও অন্তত মুক্তিলাভ হবে মনে ক'রে আমরা সকলেই খুব খুশি হ'য়ে উঠলাম—কবি পিঠাপুরমের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সেইদিনই রাত্রের গাড়ীতে কুন্নুর যাওয়া হবে। আমি সব জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় সাহেব এসে বললেন, "রানী, নিতান্ত দরকারী জিনিস ছাড়া আর কিচ্ছু নেবে না। দশদিন পরেই বোধ হয় আমাদের জাহাজ পাওয়া যাবে, কাজেই পাহাড়ে খুব বেশিদিনের জন্যে যাওয়া নয়।" যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরেছেন তাঁরা জানেন যে, কোথাও যাবার সময় কবির জিনিসের মধ্যে বাছাই করা কতো শক্ত। আজ যেটা অদরকারী কাল সেটা না হ'লে নয়। বিশেষ ক'রে শরীর যখন খারাপ তখন ভয়ে ভয়ে আরো অনেক জিনিস বেশি নিতে হয়—বলা তো যায় না কখন কোনটা হঠাৎ দরকার হবে? বনমালী যেমন সর্ব্বদা বোল্‌তো, "যেবারে-যে জিনিসটি ফেলে আসবো ঠিক সেই-বারেই বাবামশায় সেই জিনিসটি চেয়ে বসবেন; কিন্তু কতোবার হয়তো সেই জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি কখনো সে সময় দরকার হয়নি। তাই তো বাবামশায় রাগ করলেও আমি যতোটা পারি বাক্সে ভরে নিই। বাবামশায় বলেন, 'আঃ তুই বড় বোঝা বাড়াস।' কিন্তু বোঝা তো বাবামশায় নেবেন না, নেবে তো কুলিগুলো।" আমারও বনমালীর সঙ্গে মতের মিল ছিলো। কাজেই আমি মিঃ এণ্ড্রুজের কথায় কান না দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কবির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আলাদা করছি; বিছানাগুলো গোছ করা দেখে সাহেব অসহিষ্ণু হ'য়ে বললেন, "আর যাই নাও, বিছানা নেবার মোটেই দরকার নেই। কারণ গুরুদেবের জন্যে মহারাজা আলাদা একটা বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন আর বিছানা দেবেন না এ কখনো হ'তে পারে?" আমি তো অবাক! বিছানা না নিয়ে পাহাড়ে যাবো? সেখানে বিছানা না পেলে সেই শীতের মধ্যে কি উপায় হবে? যথেষ্ট গরম কাপড়ের অভাবে ঠাণ্ডা লেগে গেলে তার দায়িত্ব নেবে কে? আর মহারাজা বিছানা দিলেও কবির নিজের বালিশ, গায়ের কাপড় না হ'লে তো অসুবিধা হবে! বহুদিন ওঁর সঙ্গে ঘুরেছি, কাজেই হাতের পাঁচ সর্ব্বদা রাখা যে উচিৎ এ জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে। তাই বল্‌তে হোলো, "গুরুদেবের বিছানা না নিয়ে আমি বাড়ি থেকে কিছুতেই বেরোবো না।" সাহেব আমার উপরে বেজায় চটে গেলেন। বরাবরই ওঁর কাছে যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছি, কিন্তু এবার ওঁকে সত্যিই রাগিয়ে দিলাম। বললেন, "তুমি কি মনে করো আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধি বেশি? আমি যখন বলছি বিছানা দরকার হবে না তখন তোমার এটা বিশ্বাস না করবার কী কারণ আছে?" আমি উত্তর করলাম, "গুরুদেবের সঙ্গে যতদিন ঘুরেছি কোনোমতে যাতে ওঁর অসুবিধা না হয় সে জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। জেনে শুনে কোনো জিনিস পথের মধ্যে ফেলে দিইনি যা ওঁর কাজে লাগতে পারে। ক'লকাতা থেকে এতদূর বিছানাটা টেনে এনে ঠিক পাহাড়ে যাবার মুখেই এটা ফেলে যাব? কবির এই অসুস্থ

শরীর, তার উপর ঠাণ্ডা লাগাবার রিস্ক্ নেবে কে? মহারাজা যদি বিছানা দেনই তাহ'লে না হয় এটা খোলাই হবে না, কিন্তু সঙ্গে রাখ্‌তে দোষ কি?" এণ্ড্রুজ সাহেব তবুও যখন আপত্তি করতে লাগলেন তখন বাধ্য হ'য়ে বল্‌লাম, "মিথ্যে আমার উপর জোর করছেন। আপনি যদি বেশি গোলমাল করেন তাহ'লে কিন্তু আমি যাবো না আপনাদের সঙ্গে—আপনিই সব দায়িত্ব নিয়ে বিছানা ফেলে রেখে গুরুদেবকে পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন; আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিতে হ'লে গুরুদেবের জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হবে—এতে আপনি রাগই করুন আর যাই করুন!"

শেষকালে নিরুপায় হ'য়ে সাহেব আমার সঙ্গে একটা রফা করলেন, কিন্তু বারবার বল্‌তে লাগলেন "Rani, you are awfully obstinate."

যাই হোক, ব্যবস্থা হোলো যে শুধু কবির বিছানা, তাও নিতান্ত যা না হ'লে নয়, তাই যাবে সঙ্গে, কিন্তু আমাদের আর কারো বিছানা কিছুতেই যেতে পারবে না। নিজেদের জন্যে অত ভাবিনে, কাজেই অশান্তি এড়াবার খাতিরে, এই প্রস্তাবে রাজী হতেই হোলো। তবুও লুকিয়ে কবির হোল্ড-অল-এর মধ্যে আমাদের দুখানা কম্বল ও দুখানা সুজ্‌নী বেঁধে নিলাম। গাড়ীতে ব্যবহারের জন্যে দুটো চামড়ার বালিশ ছিলো, সেটা নিয়ে আর সাহেব কিছু আপত্তি করতে পারলেন না।

সাহেব তো আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিছানার ভার লাঘব করালেন, কিন্তু সেই খালি হোল্ড-অল-এর মধ্যে অধ্যাপক যখন তাঁর খান কুড়ি মোটা মোটা ভারি ভারি বই, দশবারো খানা বাঁধানো "বায়োমেট্রিকা" আর তাড়া তাড়া রাশিবিজ্ঞানের খাতাপত্র ভরতে লাগলেন তখন তিনি একটি কথাও বললেন না। সেই পর্ব্বত প্রমাণ বই ও কাগজের বোঝা আমার লেপের চেয়ে নিশ্চয়ই হাল্কা হয়নি তবু সাহেবের যতো রাগ আমার বিছানা সম্বন্ধে।

মাদ্রাজ ছেড়ে অবধি প্রত্যেক স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের দর্শনের লোভে অসম্ভব ভীড়—এমন অবস্থা যে কবির পক্ষে খাওয়া কি ঘুমানো শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কবি বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "এ নিশ্চয়ই এণ্ড্রুজের কাণ্ড। কাগজে হয়তো ছাপিয়ে দিয়েছে আমি কুনুর যাচ্ছি, তাই পথের মধ্যে দলে দলে লোক আমাকে দেখতে আস্‌ছে। আরে, আমি কি সারারাত এই রকম বসে কেবলি নমস্কার করতে করতে যাবো? যেমন ও বিপদ ঘটিয়েছে তেমনি তার ফলভোগ করুক—ও নিজেই 'দর্শন' দিক। প্রশান্ত, দাও সব জান্‌লাগুলো বন্ধ ক'রে। আমিতো সকলের ঐ রকম মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বসে কিছুতেই খেতে পারবো না। তাহ'লে কালই হয়তো কাগজে দেখবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমুক স্টেশনে কলা দিয়ে রুটি মাখন খাচ্ছিলেন, আর একটি মোটা সোটা ভদ্রমহিলা প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিল।"—বলেই আমার দিকে তাকিয়ে খুব হেসে উঠলেন।

আমরা তিনজন একগাড়ীতে চলেছি পাশের কামরায় আরিয়াম ও সাহেব। আরিয়াম প্রত্যেক স্টেশনে ভিড়ের বহর দেখে অন্য এক কম্পার্টমেণ্টে আশ্রয় নিলেন। কবিকে রক্ষে করার জন্যে ঐ গরমের মধ্যেও গাড়ীর সমস্ত কাঠের ঝিলমিলি তুলে দিতে হোলো। এণ্ড্রুজকে পাশের ঘর থেকে ডেকে এনে কবি বল্লেন, "তুমি আমার হ'য়ে এইসব দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলো। আমার বিশ্রামের দরকার অথচ এরা আগ্রহ ক'রে আম, মালা কর্পূর ইত্যাদি নিয়ে আসছে, এদের দুঃখ দিতে বাধে। বুঝিয়ে বলো যে, আমি অসুস্থ তাই

বিশ্রাম কোরবো বলে গাড়ীর দরজা জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছি—সবাই যেন আমাকে ক্ষমা করে। তুমি আমার প্রতিনিধি হ'য়ে এদের অর্ঘ্য নিয়ো এবং মিষ্টি কথা বলে খুশি ক'রে দিও।"

এণ্ড্রুজের একটা দিক ছিলো একেবারে ছেলেমানুষের মতো। ঐ যে কবি একটা ভার দিয়েছেন এবং বলেছেন "খুশি ক'রে দিও," তাই সারারাত না ঘুমিয়ে প্রত্যেক স্টেশনে নেবে নেবে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কবি সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মিটিয়েছেন, অর্ঘ্য নিয়েছেন, মালা পরেছেন—এক কথায় সত্যিই তাদের খুশি ক'রে দিয়েছেন।

ভোরবেলা—পাহাড়তলীতে গাড়ী গিয়ে থামলো। সাহেব একরাশ মালা, আম ও কর্পূর হাতে নিয়ে একগাল হেসে কবির কাছে এসে দাঁড়ালেন—"গুরুদেব, দ্যাখো, তোমার হ'য়ে কতো মালা আমাকে পরতে হয়েছে। সারারাত ধরে দলে দলে লোক তোমাকে দেখবে বলে এসেছিলো এইসব অর্ঘ্য নিয়ে। কিন্তু তুমি অসুস্থ, সেইকথা তাদের বুঝিয়ে বলাতে তারা তোমার গাড়ীর দরজায় ধাক্কা না মেরে আমাকেই মালা পরিয়ে গেলো।"

এণ্ড্রুজ চিরকুমার; তাই মালার কথায় কবির রসিকতার জোয়ার এলো। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "দেখো, মালা যারা পরিয়েছিলো তাদের মধ্যে কোনো মেয়ে ছিলো না তো?" শুনে সাহেবের কী হাসি—আমরাও হেসে খুন।

কুনুরে ট্রেনে না গিয়ে মোটরে যাবার আগ্রহই কবির বেশি হবে, এ কথা আমরা জানতাম। এই নিয়েও এণ্ড্রুজের সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘটেছিলো মাদ্রাজ ছাড়বার সময়। আমার স্বামী বলেছিলেন, কুনুর পর্য্যন্ত রেলের টিকিট না কিনে শুধু মেটুবালম অবধি কিনতে, কারণ কবি হয়তো পাহাড়ের ছোটো গাড়ীতে চড়ার চেয়ে মোটরে যাওয়াটাই বেশি উপভোগ করবেন। সাহেব জোর ক'রে বললেন, "না, গুরুদেবের মোটরে অতটা যেতে কষ্ট হবে।" আমার স্বামী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চুপ করে গেলেন। কুনুর পর্য্যন্তই গাড়ী রিজার্ভ করা হোলো।

ভোরে স্টেশনে নেমে দেখি ছোট রেলগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব ও আরিয়াম জিনিস-পত্র নিয়ে রেলের কামরার দিকে যেই চলে গেলেন অমনি কবি বললেন "প্রশান্ত,—দ্যাখোনা, একটা মোটর জোগাড় করতে পারো কি-না।"

দু-চারখানা ট্যাক্সি যাত্রীর অপেক্ষায় স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তার একটা ঠিক করায় কবি গিয়ে সোজা চড়ে বসলেন। এণ্ড্রুজ আমাদের ডাকতে এসে দেখেন আমরা তিনজনেই মোটরে চড়ে বসেছি। কবি বললেন, "টিকিয়ে টিকিয়ে রেলে আমি যেতে পারবো না। তুমি ও আরিয়াম জিনিস নিয়ে যাও, রিজার্ভ গাড়ী—আরামেই যাবে। আমরা তিনজন মোটরে যাচ্ছি।" আমরা আগেই জানতাম এই হবে, সেইজন্যেই সাহেবকে উনি বারণ করেছিলেন কুনুর পর্য্যন্ত টিকিট কিনতে। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় এই জ্ঞান হয়েছিল যে, শেষ মুহূর্ত্তে ব্যবস্থা বদলের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয় কবির সঙ্গে ঘুরতে হ'লে, কাজেই নানারকম ব্যবস্থা বেশি দূর পর্য্যন্ত না করাই বুদ্ধির কাজ। সাহেব দু-একবার কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, মোটরে ক্লান্তি বেশি হবে, কিন্তু কবি চুপ ক'রে বসে থাকলেন। অগত্যা সাহেবও মোটরে চড়ে বসলেন; একা আরিয়াম জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে রওনা হ'য়ে গেলেন।

বোধ হয় মাত্র সতেরো মাইল পথ। কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই কুন্নুরে পৌঁছে, মাদ্রাজের অসহ্য গরমের কথা স্মরণ ক'রে মনে হোলো যেন স্বর্গে এসেছি। সকলেরই মন খুব খুশি। বসবার ঘরে মহারাজা কবির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন, আমি সেই ফাঁকে সব জিনিসপত্র খুলে সাজিয়ে ফেলবো মনে ক'রে পাশেই শোবার ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই চক্ষু স্থির! একটা খাটে শুধু ছোবড়ার গদি পাতা—বিছানার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু একটা আলমারীতে অতিথিদের ব্যবহারের জন্যে এত রকম জিনিস রাখা হয়েছে যা দিয়ে অনায়াসেই একটা ছোটখাটো মণিহারির দোকান খোলা যায়। সাবান, পাউডার, ওডিকলোন, সেণ্ট, ক্রীম, যতোরকম প্রসাধনের জিনিস হ'তে পারে তার কোনোটাই বাদ পড়েনি। এছাড়া চকোলেট, লজেন্স, বিস্কুট, জ্যাম, জেলী, মাস্টার্ড, সস্, ওট্‌মিল, ড্যালা চিনি, কফির টিন, চায়ের প্যাকেট, সোডা, লেমনেড, সিরাপ ও শেষকালে মদের বোতল শুদ্ধু। নেই কেবল খাটের উপর বিছানা।

মহারাজার এটা ভাড়াবাড়ি। একটা বড় বাড়ি, সেটাতে নিজেরা রয়েছেন আর ছোট্ট একটা 'কটেজ' বাগানের মধ্যে—সেইটেতে অতিথিকে থাকতে দিয়েছেন। এছাড়াও আধ মাইল আন্দাজ দূরে আর একখানা বাড়ি ভাড়া করেছেন কবিরই জন্যে, কারণ দলের সবাইকে এই ছোট্টো আস্তানায় ধরা সম্ভব নয়!

কটেজটাতে পর পর তিনখানা ছোটো ছোটো ঘর। ঢুকেই প্রথমটা বসবার আর তারপরের তুটো শোবার। সঙ্গে তুটো না'বার ঘরও আছে। ঘরগুলোতে যাবার আলাদা কোনো রাস্তা নেই—প্রত্যেকখানা ঘরের ভিতর দিয়েই পরের ঘরটাতে যেতে হয়। তাই স্থির হোলো, প্রথম বসবার ঘর দিয়ে ঢুকেই মাঝের ঘরখানাতে কবি থাকবেন আর সব শেষেরটাতে আমরা। আরিয়াম ও এণ্ডরুজ সাহেব যাবেন সেই দূরের বাড়িটাতে; কিন্তু ইচ্ছে করলে তুবেলা খাওয়া দাওয়া একসঙ্গেই হ'তে পারবে, না হ'লে সেখানেও আলাদা ব্যবস্থা আছে। মহারাজা বেশ রাজকীয় চালেই আতিথ্যের আয়োজন করেছেন।

সবই তো হোলো, কিন্তু রাত্রে বিছানার কী হবে? সাহেবের বকাবকিতে কবির তোষক গদি না আনলেও গায়ে দেবার বালাপোষ ক'খানা ও আলোয়ান এবং বালিশ সঙ্গে এনেছিলাম। একটা বাড়তি কম্বলও ছিলো, সেইটাই তোষকের বদলে শক্ত ছোবড়ার গদির উপর পেতে চাদর দিয়ে শয্যা রচনা করা গেলো। রক্ষে যে গায়ের কাপড়গুলো এসেছে। কবির সম্বন্ধে তো ব্যবস্থা হোলো, এখন নিজেদের পালা। তুটি কম্বল বিনে আর কোনো সম্বল নেই। মাদ্রাজের গরমের পরে কুন্নুরের শীতটাও প্রচণ্ড মনে হ'চ্ছে। প্রায় কান্না পেতে লাগলো মাদ্রাজে ফেলে আসা বিছানার কথা মনে ক'রে। যাই হোক রাত্রে ছোবড়ার গদির উপর সুজনী পেতে এক একটা চামড়ার বালিশ মাথায় দিয়ে একটি মাত্র কম্বলেই খুশি থাকতে হবে—তা ছাড়া আর উপায় কি? সাহেব বিছানার এই রকম আয়োজন দেখে বললেন, "It is very strange Rani, you were wise to bring at least Gurudev's bedding." এর পরে আর সাহেবের উপর রাগ করি কোন্ মুখে? বুঝলাম উনি নিজের ভুলের জন্যে খুবই লজ্জিত হয়েছেন; বিশেষ ক'রে আরো লজ্জিত হয়েছেন আমাকে অত বকেছিলেন বলে।

এণ্ড্রুজ সাহেবের গাম্ভীর্য্যটাই লোকে জানে। কতো কাজ করছেন, কতো দেশ বিদেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, বড়লাটের সঙ্গে দেখা করছেন, মহাত্মাজীর কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন, শান্তিনিকেতনের জন্যে পরিশ্রম করছেন—ওঁর এই ছবিটাই সাধারণের কাছে পরিচিত। কিন্তু ওঁর মধ্যে যে একটি পাগল শিশুও লুকোনো ছিলো সে খবর বোধ হয় অনেকেই জানে না, সেইজন্যেই সেবারকার সব গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে।

প্রথম রাত্রেই এক মজার কাণ্ড! রাত সাড়ে নটা দশটা হবে। খাবার পর খানিকটা গল্প সল্প ক'রে কবি বললেন, "এণ্ড্রুজ, এবারে তোমাদের বাসায় যাও, আমরা দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ি।" পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি, একখানা কম্বলে যদি শীত না যায় তো কী করবো? অত দুঃখের মধ্যেও কবির বিছানাটা অন্তত সঙ্গে এনেছি বলে মনে মনে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ সাহেব বললেন, "গুরুদেব, তোমাকে ছেড়ে অত দূরে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমি এই কৌচটার উপরেই শুয়ে থাকবো।" কবি স্থানের ঘরের অভাব জানিয়ে সাহেবের প্রস্তাবে আপত্তি করায় সাহেব চলে গেলেন; আমরা সদর দরজা বন্ধ ক'রে যে যার মতো শুয়ে পড়লাম। আগেই বলেছি, কবির ঘর দিয়েই আমাদের ঘরে যেতে হয়। আমাদের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে আগল না দিয়ে ভেজিয়ে রেখেছি যাতে হঠাৎ কোনো দরকার হ'লে কবি সহজে ডাকতে পারেন।

রাত এগারোটা কি বারোটা হবে। সবে ভালো ক'রে ঘুমটা জমেছে, হঠাৎ জেগে গিয়ে কবির গলা কানে এলো: "এণ্ড্রুজ, তুমি খবরদার ওদের ঘরে ঢুকো না, ওরা এখন ঘুমোচ্ছে; তুমি কী বলে এই সময় ও ঘরে যাচ্ছো? শোবার ঘরে ঢোকাটা যে ভদ্রতা নয় তা কি ইংরেজ হ'য়েও তুমি জানো না?" আর সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস ক'রে এসে দরজাটা আমার খাটের গায়ে লাগলো—চোখ মেলে দেখি, এণ্ড্রুজ সাহেব খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। খুব অপরাধী কচি ছেলের মতো মুখ ক'রে বললেন, "প্রশান্ত, আমাকে একখানা কম্বল দিতে পারো?" উনি থতমত খেয়ে নিজের কম্বলখানা গায়ের থেকে খুলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এইখানা নিয়ে যান।" সাহেব নিজে জোর করে বিছানা আনতে দেননি, তার উপরে গায়ের থেকে গরম কাপড় তুলে নিয়ে যেতে বেজায় অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বললেন, "না না, কম্বলের দরকার নেই, আমার এইটে হ'লেই হবে" বলে আমাদের জুতো, বই, কাপড় এবং নানা রকম টুকিটাকি ভরা হোল্ড-অলটা যেই মাটি থেকে টান মেরে তুলেছেন অমনি সব জিনিস পত্র ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। সেই জিনিস অতরাত্রে আবার সব গুছিয়ে তুলতে হবে—মহা হাঙ্গাম। আমার স্বামী তো জোর ক'রে সাহেবের ঘাড়ে কম্বলটা চাপিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা দুজনে একটাতে কোন মতে চালিয়ে নেবো। আপনি কম্বলটা নিয়ে চলে যান তো, একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে সবাই ঘুমোতে পারি।"

অগত্যা সাহেব চলে গেলেন।

দরজা-টরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছি। আবার ঘণ্টা দুই পরে পাশের ঘরে হৈ হৈ। কবি সাহেবকে ধরে বকছেন, "নিজেও ঘুমোবে না, আমাদেরও ঘুমোতে দেবে না। এ তো বেজায় মুস্কিল হোলো দেখি। স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরে যে মাঝরাত্রে ওরকম ঢুকে পড়তে নেই এ তুমি কি ক'রে ভুলে গেলে জানিনে। ইংরেজ হ'য়ে এইটুকু ভদ্র

রীতিও কি তুমি শেখোনি? এ কী রকমের তোমার ব্যবহার?" কবি তখন সত্যিই রেগে গিয়েছেন। আমরা তো শুনছি আর খুব হাসছি, এবং ইচ্ছে ক'রেই সাড়া দিচ্ছিনে যে, দেখি শেষ পর্য্যন্ত কী হয়। ঐত বকুনি সত্ত্বেও সাহেব আবার সোজা ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—"প্রশান্ত, রানী বিছানা আন্‌তে চেয়েছিলো আর আমিই জোর ক'রে বাধা দিয়েছিলাম, কাজেই এ কম্বল আমার নেবার কোনো অধিকার নেই। এটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।" আমরা দুজনেই এই ছেলেমানুষির জন্যে সাহেবকে খুব বকুনি দিয়ে কম্বল কাঁধে ওঁকে আবার ফেরৎ পাঠালাম। বাকি রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটলো যে, সাহেব আবার কখন এসে উপস্থিত হন।

দুদিন পরে সকালে সাহেব একটা লেখা এনে কবিকে দিয়ে বললেন, "গুরুদেব, খালি তুমিই গল্প লেখো; দ্যাখো, আমিও আর্জ একটা গল্প লিখেছি।" গল্পে ভদ্রলোক তাঁর সেদিনকার রাত্রের দুঃখের কাহিনী সব লিখে ফেলেছেন—ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই।

খাবার পরে কবি যখন সাহেবকে শুতে যেতে বল্লেন তখন বাসায় না গিয়ে তিনি বাগানের মধ্যেকার কাঠের "পারগোলা"টাতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন; মনে ভেবেছিলেন চারিদিকের ত্রিপলের পর্দ্দা ফেলে দিলেই আর শীত লাগবে না। খানিক পরেই সেখানে একটি লোক এসে জুটলো, সে এসে ওঁকে বললো, "আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দাও।" লোকটার ভক্তি দেখে তো সাহেব মহা খুশি। খানিকক্ষণ আলোচনার পর সে যখন পাঁচটা টাকা ধার চাইলো তখন বুঝলেন, লোকটা একটা ভণ্ড—দিলেন তাকে তাড়িয়ে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীত বাড়তে লাগলো। বাধ্য হ'য়ে এলেন সেই কম্বল চাইতে, কিন্তু আমার স্বামীর গায়ের থেকে গরম কাপড় তুলে নিয়ে গিয়ে এত অনুশোচনা হোলো যে, ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা না ক'রে থাকতে পারলেন না। কিন্তু আমাদের সকলেরই কাছে বকুনি খেয়ে বাধ্য হ'য়ে যখন কম্বল নিয়েই ফের ফিরে আসতে হোলো—তবু সেটা গায়ে দিয়ে নিজের শীত নিবারণ করেননি। অন্যায় করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিৎ বলে সারারাত ঐ বাগানের কাঠের বেঞ্চিতে বসে কেঁপেছেন আর কম্বলটা পাশে পাট ক'রে রেখে দিয়েছেন। যুক্তিটা হ'চ্ছে এই যে, "আমার জন্যেই যখন রানী ও প্রশান্ত বিছানা আন্‌তে পারেনি তখন আমারও আরাম ক'রে গরম কাপড় গায়ে দেওয়া উচিৎ নয়—অতএব সারারাত শীত ভোগ করতে হবে।" কবি ঠাট্টা ক'রে বল্‌লেন, "একেই বলে খাঁটি খ্রীষ্টান। এতে লাভ হোলো কার? প্রশান্ত যখন কাপড়খানা নিলোই না ফিরে তখন তুমিও সেটা ব্যবহার না ক'রে শীতে কাঁপবার কী মানে? কম্বলটা থেকেও কারোই ভোগে লাগলো না, এটার মধ্যে কি কোনো বুদ্ধির পরিচয় আছে?" ভবিষ্যতে এবকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই জন্যে আমরা সবাই মিলে সাহেবকে খুব ঠাট্টা করলাম। এ ব্যাপার এক এণ্ড্রুজ সাহেব ছাড়া আর কারো দ্বারাই সম্ভব হোতো না।

কুন্নুরে কবি ঠাণ্ডার জন্যেই হোক, বা জায়গার গুণেই হোক অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। শরীরের আরো উন্নতি হোতো যদি মহারাজা অতিথি সেবার আয়োজন একটু কম করতেন।

কবি স্বভাবতই খুব স্বল্পাহারী; কুন্নুরে গিয়ে খাওয়া আরো গেলো কমে। কারণ এত

প্রচুর পরিমাণে নানারকম খাদ্য তিন বেলা তাঁকে দেখতে হোতো যে, ভোজ্য পদার্থমাত্রেরই প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেলো।

আমাদের তিনজনের সেই বসবার ঘরেই খাবার জায়গা। এত রকম জিনিস আস্‌তো যে, যে টেবিলটা ঘরে ছিলো তাতে কুলোতো না। প্রত্যেকবার খাবার সময় ঘরের এক পাশে দুটো তেপায়া টেবিল দুদিকে রেখে তার উপর কাঠের তক্তা ফেলে লম্বা আর একটা টেবিল বানাতে হোতো। নইলে অতগুলো পাত্র রাখা হবে কোথায়? কবি অসহায় ভাবে বসে বসে এইসব আয়োজন দেখতেন। তারপর যখন একটার পর একটা ডিস্ আস্‌ছে তো আস্‌ছেই তখন ওঁর মুখে এমন করুণভাব ফুঠে উঠতো যে, দেখলে মনে হোতো যেন কোনো শারীরিক কষ্ট হ'চ্ছে। প্রত্যেকটা জিনিস ওঁর সামনে আস্‌ছে আর উনি "না" বল্‌ছেন, আবার সেটা সরিয়ে রেখে আর একটা নতুন থালা, এবং সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার উক্তি যে, "এটা মহারাণী নিজে তৈরী করেছেন আপনার জন্যে।" মহারাণীর পর্দ্দা, কাজেই তিনি থাক্‌তেন নেপথ্যে। মহারাজাই বসে থেকে খাওযাতেন। প্রথমদিন ভদ্রতার খাতিরে কবি এক-আধটা জিনিস চেখে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অন্ধ্রদেশীয় রান্নায় এত অসম্ভব ঝাল। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ খাবার প্রত্যেকবার দেখতে দেখতে ওঁর খাওয়া প্রায় বন্ধ, এবং আমাদেরও পর্য্যন্ত সেই দশা হবার জোগাড়। প্রথমে বিলিতি রান্না—যতো রকমের যা কিছু কল্পনা করা যায়, অর্থাৎ পরিজ, স্রেডেড্ হুইট্, ফোর্স ইত্যাদি যা কিছু প্রাতরাশে খায়। তারপর ডিমের সচরাচর যতো রকম বৈচিত্র্য হ'তে পারে, তারপর মাছেরও তাই এবং মাংসেরও। এগুলো হোলো বিলিতি পর্ব্ব। এরপরে শুরু দেশী রান্নার—তার আর অন্ত নেই। প্রত্যেকটাই দু-রকম ভাবে রান্না—ঝাল ও আঝালে। কাজেই তক্তা ফেলে টেবিল না বানালে এগুলো ধরবে কোথায়? কবি খাবার কোনো চেষ্টাও করতেন না, চেয়ে দেখেই ঘাড় নাড়তেন আর চাকরে প্লেট সরিয়ে নিতো। এই রকম ক'রে ক'রে যখন সব সরে যেতো শেষকালে ফলের বাসন থেকে একটা কিছু তুলে নিতেন। ক্বচিৎ কখনও মহারাজের বিশেষ অনুরোধে যদি কোনো একটা ডিস্ থেকে এক টুক্‌রো কিছু তুলে নিতেন তবে সেটা আর মুখ পর্য্যন্ত উঠতো না—নাড়াচাড়া ক'রে প্লেটেই ফেলে রাখতেন। আমি কিছু বল্‌লে আস্তে আস্তে বল্‌তেন, "আমার এত গা কেমন করছে যে কিছু মুখে দিতে গেলে টেবিলের ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।" যেদিন সাহেব আমাদের খাবার টেবিলে উপস্থিত থাকতেন সেদিন কবির একটু সুবিধা হোতো। এণ্ড্রুজ মহারাজকে কথায় বার্ত্তায় অন্যমনস্ক ক'রে দিতেন আর সেই ফাঁকে কবির খাওয়া শেষ হ'য়ে যেতো।

রবীন্দ্রনাথের চিরকালই খুব ভোরে চা খাওয়া অভ্যেস, কারণ বরাবরই উনি তিনটে থেকে চারটের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। এই জন্যে বিদেশেও যখন যেখানে থেকেছেন সব হোটেলের ম্যানেজারই ওঁর জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে—অবিশ্যি ভোর ছটায় চা রুটি পাবার জন্যে বেশি ক'রে দামও দিতে হয়েছে। মনে আছে নরওয়েতে কবি যাঁদের বাড়ি অতিথি ছিলেন তাঁরা কবিকে বিশেষ ক'রে ভোর সাড়ে পাঁচটার চা দেবার জন্যে আলাদা একটি দাসী রেখেছিলেন। আমরা দুজন কবির সঙ্গেই তাঁর ঘরে বসে সাড়ে পাঁচটার সময় খাওয়া শেষ ক'রে নিতাম আর মিঃ ও মিসেস্ ভালাহান্‌সান্‌এর সাক্ষাৎ মিল্‌তো বেলা নটায়।

পিঠাপুরমের মহারাজা ভারতীয় ধনী লোক, কাজেই প্রথম দিন সকালেই লক্ষ্য করলাম, তাঁদের বাড়ির চাকর বাকরও কেউ বেলা নটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না—মনিবদের তো বেলা বারোটায় দর্শন মেলে। এবং তারও পরে মহারাজা আমাদের ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের সব খাবারগুলো একসঙ্গে খাওয়াতে আসেন, তাই বোধ হয় অত রকমের পদ।

যাই হোক, প্রথম দিন যখন দেখা গেল সাড়ে দশটার আগে চা পাবার আর আশা নেই তখন ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করা হোলো। রাত্রে খাবার পরে চাকরটাকে বললাম—যদি ফ্লাস্কে একটু গরম চা ও একটা পাত্রে দুধ ও কিছু রুটি মাখন ঘরে রেখে দিয়ে যায় তা হ'লে আর কিছুই হাঙ্গাম হয় না। অতি সহজেই ভোরে কবিকে চা খাইয়ে দিতে পারি। ওমা! তারপরে যা ঘটলো তাতে ছেলেবেলার কবিতা "অবাক কাণ্ড ভাই, এমন ব্যাপার আর কখনও জন্মে দেখি নাই" মনে পড়লো। আমি ফ্লাস্কের কথা বল্‌বামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তিনটে গ্যালন ফ্লাস্ক নিয়ে এসে হাজির। একটাতে চা, একটাতে কফি আর বাকিটাতে দুধ। খাবো আমরা তিনজনে, তার জন্যে এলো তিনখানা পাঁউরুটি—স্লাইস্ ক'রে কাটা, তিনখানা আস্ত এবং তিনখানা কেটে তাতে মাখন মাখানো। এছাড়া মিষ্টি রুটি (Bun) জ্যাম্ জেলী তো আছেই। যাই হোক, খাবারটা ভোরে হাতে পাওয়া যাবে মনে ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

রাত্রে প্রত্যিদিন এইরকম জলখাবার টেবিলের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে যায়, আমরা ভোরে সাড়ে পাঁচটা ছ'টায় খাওয়া চুকিয়ে ফেলি। সেই সময়টাতেই কবি যা একটু কফি, রুটি ইত্যাদি খেয়ে নেন, তার পর সারাদিনের মধ্যে ঐ একটু আধটু ফল।

ফলেরও একটা মজা আছে। প্রথম দিনই বিকেলবেলা চায়ের সময়ে পেয়ালা ভরে আমের রস এলো। আমি ও কবি যে দুটো পেয়ালা তুলে নিলাম তারা কিছু গোলমাল কোরলো না, কিন্তু অধ্যাপক যেই এক চুমুক দিয়েছেন অমনি দেখি, চোখে জল ভরে এসেছে —মহারাজা সামনে বসে, কাজেই ফেলতেও পারেন না, গিলতেও পারেন না। অমন লোভনীয় সোনার বরণ আমের রসের ভিতর প্রচুর লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো থাকবে, কে একথা কল্পনা করেছিলো?

সেদিন ওঁর অবস্থা দেখে কবি পরে বলেছিলেন, "ওহে প্রশান্ত, অন্ধ্রদেশীয় আমের রসকেও বিশ্বাস নেই। আজ বড্ড ফাঁড়া কেটেছে রানীর আর আমার। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ও রস দেখে লোভ করছিনে। সাধে শাস্ত্রে বলেছে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু?"

সত্যিই প্রায় মরণদশা—যে মানুষ বাড়িতে লঙ্কা এসেছে শুনলে ভয় পান তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোলো বিষঝাল আমের রস গিলে।

আম রোজ মহারাজার বাগান থেকে পার্শেলে আস্‌তো। তারপর টেবিলে সেটাকে পরিবেশন করা হতো টিপে টিপে একেবারে তলতলে নরম ক'রে দিয়ে—উদ্দেশ্য যাতে খোসাটাতে ফুটো করে মুখ দিয়ে চুষে খেতে পরিশ্রম না হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলেমানুষের মতো দুহাতে আম ধরে চুষে খাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে দাড়ি বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে, এটা যে কি রকম 'কমিক' দেখতে তা নিজেই কল্পনা ক'রে খাবার মধ্যে বার বার হেসে উঠতেন, অথচ এমন তলতলে আম যে তাকে কেটে খাবারও যো নেই। ভাগ্যি যে, এটা সেই ভোরের খাবারের সঙ্গে চলতো কাজেই মহারাজা

উপস্থিত থাকতেন না। কবি আম খাবার সময় রোজ বলতেন, "আচ্ছা, একি ছেলে-মানুষি বলতো? ভদ্রভাবে আম খাবারও উপায় নেই? তিন জনে তিন শিশুর মতো আম মুখে দিয়ে চুষতে লেগেছি আর দাড়ি বেয়ে রস পড়ছে। আহা! কী দৃশ্য!"

প্রথমদিন তো আম খাবার সময় কবিও যতো হাসেন আমরাও তত হাসি। অথচ লজ্জার ভয়ে রসের পেয়ালা প্রতিদিনই ফেরৎ যাচ্ছে। রসের পেয়ালা দেখলেই কবি বলতেন, "কাজ নেই বাপু, শেষে প্রশান্তর মত হঠাৎ দেখবো বেদনায় ভ'রে গিয়েছে পেয়ালা। তার চেয়ে না হয় অল্পক্ষণের জন্য শৈশব দশাতেই ফিরে গেলুম বা।"

কুন্নুরে জলহাওয়ার গুণে রবীন্দ্রনাথের শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ হ'তে লাগলো, মনও খুব খুশি—শুধু এক যা খাওয়ার অত্যাচার। একদিন অধ্যাপককে বললেন, "ছাখো, এখানে বেশ আরামেই ছিলুম, কোনো লোকজনের উপদ্রব নেই, গরমের কষ্ট নেই, তোমারও দিনরাত অঙ্ক কষায় ব্যাঘাত ঘটছে না, কিন্তু এরা দেখছি আমাদের খাইয়েই তাড়াবে।"

(ক্রমশ)

রানী মহলানবীশ

# রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

এ কবিতাটির রচয়িতা ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের একজন পল্লী-কবি। পল্লীর সাধারণের সুখদুঃখের কথাই তিনি তাদের মত ক'রে গাথায় ছড়ায় গাইতেন, সাহিত্যিক রচনা ও কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রায় সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু তাঁর ছড়া গান পল্লী অঞ্চলের কৃষক ও জনসাধারণের প্রিয় হ'য়ে ওঠে। মাত্র বৎসর দুই পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন—ভারতীয় গণনাট্য-সঙ্ঘের শম্ভু মিত্রের মুখে ময়মনসিংহে কবিতাপাঠ শুনে তাঁর স্বাভাবিক রসবোধ জাগ্রত হয়। পল্লীকবি দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে অগ্রসর হ'য়ে এসেছেন,—সাহিত্যিকসমাজ তাঁদের সৃষ্টিতে ও দৃষ্টিতে কতটা পল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এই সূত্রে তা ভেবে দেখবার মত।—সম্পাদক, পরিচয়।

আজি এই পূণ্য দিনে
গাঁয়ের কিসান
কি গাহিব গান—
নাই ভাষা
দৈন্য হতাশায়
মন ম্রিয়মান।

হয়ত বা কেহ কেহ
বসি নিজে চৌতালের 'পরে
গর্ব করে—
শিখিয়াছি রবীন্দ্রের গীতি
গাই নিতি

বেহাগ খাম্বাজ ও ভৈরবী
নানাবিধ সুরে।

হয়ত বা দু' একটি পল্লীর গান
কাকডাকা সুরে
আমিও দিয়াছি টান
লোক দেখানোর তরে,
সে-সুর বেসুর বাজে
পৌঁছে নাই সবার অন্তরে।
ভেঙ্গে গেছে মানুষের মন
ভেঙ্গে গেছে কুঁড়ে ঘর
কামার ছেড়েছে গ্রাম
গুটায়ে হাপর,
জেলে কাঁদে জাল নাই
তাঁতী ব'সে গুটাইয়া তাঁত
এদের কান্নার সুরে
কেবা করে কর্ণপাত।
অজ্ঞতায় অন্ধকারে আছি
কোটি কোটি পুরুষ রমণী
কেউ দেয় নাই জানি
তব বাণী—
দীপশিখা খানি
এদের সম্মুখে আনি—
হে কবি
তোমার সোনার মাঠে কে কাটিবে ধান
কে গাহিবে গান
কেউ রুগ্ন শুয়ে আছে
কেউ গ্রাম ছেড়ে গেছে
কেউ ত্যজিয়াছে প্রাণ
তোমার মাঠের রাজা
মরেছে কিসান।

হঠাৎ তোমার ডাক
কোন ফাঁকে পশিয়াছে কানে,
'ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই—'
তাই দলে দলে
যারা বেঁচে আছে
তারা চলে।
তারা দল বেঁধে আসে
দল বেঁধে যায়
দল বেঁধে হাসে
দল বেঁধে গায়,
ভাঙ্গা পরিবার
আবার গড়িতে চায়।
এদের অস্পষ্ট বুলি
কেউ বুঝে কেউ বুঝে না
কেউ শুনে কেউ শুনে না
গাঁয়ের বারতা
এদের প্রাণের কথা,
তবু বারে বারে
ওরা বলে মানুষেরে—
ঘুচাও মোদের ব্যথা
ওগো দাও অধিকার
মানুষের মত
বেঁচে থাকিবার।

নিবারণ পণ্ডিত

# আষাঢ়

অজস্র নির্ঝর বেগে আনো শান্তিধারা
দগ্ধ মাঠে
হে আষাঢ়,
কম্পিত বর্ষণছন্দে স্বপ্নে গড়া মেঘের পাহাড়
ভাঙো নবধারাজলে
হৃতশস্য মৃত্তিকার বিশুষ্ক অঞ্চলে,
অমৃত-বর্ষণে স্নাত রুক্ষ গ্রামে গ্রামে
জ্বালো স্বর্ণশস্যশিখা,
অগণিত বঞ্চিতের কুটিরে কুটিরে

কৃষাণের গানে গানে ঋণমুক্ত সাবলীল প্রাণ
আবার জাগাও মাঠে মাঠে
হে আষাঢ়,
ভাঙো ভাঙো স্বপ্নময় মেঘের পাহাড় !

বিজলী আলোয় রাঙা মোহভাঙা মনে
মুখর বর্ষণে
আনো স্নিগ্ধ জীবনের শ্যামাঞ্জন মায়া
জ্বালো দীপ
জ্বালো স্বর্ণদীপ
নৈরাশ্য-তিমিরে মগ্ন হৃদয়ের মৌন তমসায়
মুছে দাও দুঃস্বপ্নের ছায়া
জাগাও প্রাণের কাব্য গানের বন্যায়।

কবি-গর্ব্বে বিজয়িনী
দূর উজ্জয়িনী
হে আষাঢ় আজ মনে হয়
অলস মেদুর স্বপ্নে মেঘের পাহাড়,
ছায়াশ্যাম জম্বুবনে
সজল বিরহে মৌন উদাস নয়নে
হে আষাঢ় আজ মনে হয়
অতীতের উজ্জয়িনী স্মৃতির আলেয়া
এ জীবন-সিন্ধুকূলে দুঃস্বপ্নের খেয়া।
আজ মনে হয়
এ সমাজ এ জীবন রাজসভা নয়
নবরত্নে অলঙ্কৃত
রূপবতী নটিনীর নূপুর ঝঙ্কৃত
শিপ্রাতটবিহারিণী তন্বীশ্যামা-তরুণী বেষ্টিত
বিরহবিলাসী কবি
এ জীবন কালিদাস নয়।

হে আষাঢ়,
ভাঙো ভাঙো দুঃস্বপ্নের মেঘের পাহাড়
কল্পনার ইন্দ্রধনু আকাশের বর্ণ-মরীচিকা
লুপ্ত করো হে আষাঢ়
দীপ্ত করো জীবনের শিখা।

এ যুগের কবিচিত্তে উদ্দাম ঝড়ের নৃত্যদোলা
দোলাও তাণ্ডব তালে,
পিঙ্গল বৈশাখ
ছন্নছাড়া গণমনে মিলনের মন্ত্র দিয়ে যাক্।
হে আষাঢ়, সজল আষাঢ়,
অজস্র নির্ঝর বেগে রণক্লান্ত সারা বিশ্বময়
নবমন্ত্রে প্রাণে প্রাণে গানে গানে নবীন বিস্ময়
আনো লক্ষ মূক বুকে, ঘুচাও সংশয়
হে আষাঢ়·········!

বিমলচন্দ্র ঘোষ

## স্মরণ

ক্বচিৎ ঘুমের ঘোরে ভেসে ওঠা ছবির মতন
ধূপছায়া রং মাখা দূরের আকাশ
মনে পড়ে—দূর যেন হাজার মাইল!
ধুলোমাখা হাঁটা পথ, কাঁটাঝোপ, ভাঁটি-শরবন,
কাঁচাসোনা রং মেখে উড়ে যায় চিল—
ধানকাটা হ'ল শেষ, জমা করা রাশ
বাড়ির উঠোনে—যেন ঘনীভূত বুকভরা সুখ।
সে দেশে মানুষ কারা, কারা সেই প্রাণের মালিক
কিছুই পড়ে না মনে—চেনা জানা সবগুলো মুখ
ভুলে গেছি; কারা যেন, কি যে ছিল নাম?
তাদের ঠিকানা জানো, জানো সেই দেশ কোনদিক?
হাজারো ব্যূহের মাঝে জাগে শুধু আশাপুর গ্রাম
শ্রীপুর, কণকদ্বীপ—রং ধোয়া ছবির মতন—
ধুলোমাখা হাঁটা পথ, কাঁটাঝোপ, ভাঁটি-শরবন।

তোমরা কি বেঁচে আছো আজ এই সোনার সকালে?
মারীঝড়ে ভাঙা ঘর, পোড়া মাঠ, গ্রামের শ্মশান
আজও কি ভরেনি গানে? কৃষ্ণচূড়া ডালে
আগুন জলেনি আজো—স্বর্ণজালা রৌদ্রের আভায়?

আমার দু'চোখে ফণিমনসার কাঁটার বেদনা
এখনো যায়নি মুছে বহু গান, প্রাণের সভায়;
একদিন এসেছিলে এইখানে মানুষের ভীড়ে
তোমার গ্রামের যারা সহজাত মমতার খোঁজে।
তোমরা কি ফিরে গেছ মধুমতী চন্দনার তীরে,
আবার নিজের দেশে—পরাজিত প্রাণের সম্রাট ?
লাঙলে ওঠেনি সোনা, ধানভরা মাঠ
বাতাসে ওঠেনি দুলে আদিগন্ত সকাল-বিকাল ?

গ্রামে ফিরে যাই নাই আজ কতকাল।

অবন্তী সান্যাল

## অসমাপ্ত

মানুষ দেখেছি শুধু—দেখিনি হৃদয়।

মাটির নরম বুকে লাঙল-নখর এঁকে
যে সব তরুণ
মাঠে মাঠে জেলে দেয় সবুজ আগুন—
যে প্রাণের গভীর উত্তাপে
শীষগুলি মাথা তোলে
জীবনের ছোঁয়া লেগে কাঁপে,
সে হৃদয়ে রয়েছে কি মেঘ রৌদ্র প্রেম ভালোবাসা ?
কোন কামনার ফুল ভাবনার রঙ
রামধনু-আশা
সে হৃদয়ে রয়েছে কি জুড়ে ?
আমরা জানি না তাহা
কখনো গাহিনি গান সেই সুরে সুরে।

সন্ধ্যা-ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে
বন-তুলসির ঝোপে ঝাড়ে
জীবনের তরু হতে ঝরে পড়া কোন তরুণীকে
আজো মনে পড়ে।
সে সন্ধ্যার ঝিঁঝিঁদের চিরদিন ডাক শুনে শুনে
পৃথিবীর প্রতিবেশী ওই সব তরুণের মনে
কোন দিন কোন দোলা এতটুকু লাগিয়াছে কি-না
এ এক বিচিত্র কথা—আমরা তা এখনো জানি না।

জীবনের রাঙা অভিধানে
অনেক—অনেকখানি হৃদয়ের মানে;
স্নেহ প্রেম অভিমান বিরহ বিচ্ছেদ
তারি সাথে মিশে গিয়ে শরীরের রক্ত আর স্বেদ
কী কাব্য রচনা করে কে জেনেছে তাহা ।

মানুষ মরেছে জানি কত অগণন,
ঝরেছে হৃদয় তারি সাথে
সে কথারো আছে প্রয়োজন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

## সচেতন

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মর ধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোব আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা ;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে
ফোটাবো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে, দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় ঃ
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;
অঙ্কুরিত বন্ধু যতো মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহতের দলে,
জয়ধ্বনি কিশলয়ে ঃ সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র তবু তুচ্ছ নই জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো ঃ হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমাকে আমি হাতছানি দেবো বারে বারে ;
ফল দেবো, ফুল দেবো, দেবো আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

# অভিযান

( পাঁচ )

নদীর ঘাট পার হ'য়ে পাঁচমতী গ্রামখানাকে পাশে রেখে রাস্তা চলেছে শ্যামনগর। এবার রাস্তা অনেক ভাল। পুরানো বাদশাহী শড়ক, দু'খানা গাড়ী পাশাপাশি চললেও দু'পাশে খানিকটা ক'রে পথ পড়ে থাকে সঙ্কীর্ণ ফুটপাথের মত। স্থানে স্থানে তিনখানা গাড়ী চলবার মত প্রশস্ত। আগে আরও প্রশস্ত ছিল। এখন দু'পাশের ধানজমির মালিকেরা পথ কেটে কেটে জমির অন্তর্গত ক'রে নিয়েছে। চাষীদের ওই একটা রোগ। সে কালে, মনে পড়ে নরসিংয়ের, তাদের গ্রামের ছোট পথটার পাশ কেটে এমন ছোট ক'রে দিয়েছিল এক চাষী যে, গরুরগাড়ী যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল; চাষীকে ডেকে শাসন করেছিল তার জেঠা মাধব সিং; বলেছিল—তু শালা ছিঁচকে চোর। আধা হাত, আধা হাত হর-বরিষ কাটিয়ে লেও। নজর মে আসে না। আরে শালা মরদ হো, তুমারা কিস্মৎ হ্যায় তো লাঠিকে জোরসে লে লেও যেতনা ইচ্ছা হোয় তুমারা—দেখে এক দফে! চাষীকে দিয়ে সেই বছরই মাধব সিং সে রাস্তা ঠিক ক'রে নিয়েছিল। এখানে কে রাজা কে গোঁসাই। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার বাইসিক্ল হাঁকিয়ে আসে যায়—চোখে তার এসব পড়ে না তা নয়; চোখে পড়ে, হাঁকডাকও করে; শেষ পর্য্যন্ত পকেটে কিছু পুরে নিয়ে যায়।

রাস্তা শ্যামনগরের দিকে যত অগ্রসর হয়েছে অবস্থাও তত ভাল হয়েছে। মেটে শড়ক হলেও রাস্তা বেশ সমতল। কিন্তু গাড়ী এবং যাত্রীর ভিড়ও বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী আসছে শ্যামনগর থেকে। এখানে বলে 'কেরাচি গাড়ী'! শেয়ারের গাড়ী। শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী চলেছে; পাঁচমতী পর্য্যন্ত প্রতি শেয়ারে আট আনা ভাড়া। অধিকাংশই মামলা-মকদ্দমার যাত্রী। বিকেলের দিকে 'কেরাচি গাড়ীর' সংখ্যা বাড়বে। পাঁচমতী পর্য্যন্ত যাবে, রাত্রে সেখানে থাকবে, পরদিন আটটায় যাত্রী নিয়ে আবার ছুটবে শ্যামনগর।

—আব তো রাস্তা ভালো আসিয়ে গেলো, জোর সে চালাইয়ে দাও ভাইয়া। পিছন থেকে তাগিদ দিলে শুখনরাম।

পিছন ফিরে তাকালে নরসিং।

—জোর সে—জোর সে। স্পীড বাড়াইয়ে দিন। শুখনরাম আরও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে।

এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিলে নরসিং। শুখনরামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সিটের অপর যাত্রীটিকেও দেখবার ইচ্ছা হ'ল। এ ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাত্রী যাত্রিনী হ'লে মুখ ফিরিয়ে দেখার বিপদ আছে। সঙ্গের পুরুষেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। লোকের রাগকে সে ভয় করে না, কিন্তু বদনামকে ভয় আছে। প্যাসেঞ্জার কমে যায়। মেয়েছেলে নিয়ে এমন ড্রাইভারের গাড়ীতে উঠতে চায় না লোকে। এ ক্ষেত্রে নরসিং তার সামনে পিছনের গাড়ী এবং পথিক দেখবার জন্য যে আয়নাটা আছে সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দেয়। পিছনের রাস্তার বদলে তখন গাড়ীর ভিতরটা দেখা যায়। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলে সে।

নিতাই একটু হাসলে। এর গূঢ় অর্থ নিতাইয়ের কাছে অজ্ঞাত নয়।

আয়নায় মেয়েটির মুখ ভেসে উঠেছে। মেয়েটি হাসছে বলে মনে হ'ল। অতি মৃদু হাসি। আয়নার মধ্যেই মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল, আয়নার দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি। চোখ নামিয়ে নিলে সে। আবার তাকালে। এবার একটু ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে। মেয়েটির মুখের হাসিটুকু আশ্চর্য্য। ঠোঁটের কোল ছাড়া আর কোথাও এতটুকু চিহ্ন নাই, চোখের কোণে না, নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্য্যন্ত বাঁকা দাগে পর্য্যন্ত না।

—বাঁয়ে—বাঁয়ে। বাঁয়া রাস্তা সে। শুখনরাম হাঁকলে।

শ্যামনগরের প্রবেশ মুখে রাস্তাটা তিনটে রাস্তায় বিভক্ত হয়েছে। একটা সোজা চলে গিয়েছে, একটা ডাইনে একটা বাঁয়ে।

এ রাস্তাটার উপর মালবোঝাই গরুর গাড়ীর ভিড় বেশি। ধানের কারবার, কলাই লঙ্কা পেঁয়াজ আলুর আড়ৎ, জালানী কাঠের আড়ৎ, দু-একটা কয়লার ডিপো। তারই মধ্যে শুখনরামের গদি। ধান চাল তামাকের ব্যবসা। পাকা বাড়ি। আপাদমস্তক শিক দিয়ে ঘেরা। বারান্দায় তক্তপোষের উপর তোষক এবং চাদর পেতে মালিকের বসবার জায়গা। মালিকের বসবার জায়গায় বসে আছে শুখনরামের চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে।

শুখনরাম বললে—বাস করো, রোখো।

শুখনরাম নামল। সর্ব্বাগ্রে সে হুকুম দিলে—ছোট পেটিয়াটা আগে নামাও। তামাকের ছোট একটা পেটি। ওটাকে সে সঙ্গে নিয়েছিল। শুখন ছেলেকে বললে—একদম উপরে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা হয় যেন—নিজে দেখবি।

ছেলে বললে—উ জেনানী ?

শুখন ধমকে উঠল মেয়েটাকে—এই উতারো। এই হারামজাদি কুত্তি !

আয়নার ভিতর দিয়ে নরসিং তখনও তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও মধ্যে মধ্যে তাকে দেখছিল; ধমক খেয়ে চমকে উঠল সে। তারপর আত্মসম্বরণ ক'রে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

শুখন বললে—ভিতর নিয়ে যা। ঝি। নতুন ঝি একঠো নিয়ে এলাম। তোর মায়ের সেবা করবে।

নরসিং নেমে এসে দাঁড়াল।—ভাড়া।

শুখন বললে—ভাড়া লেও। লেকিন বহুৎ বেলা হইয়েছে, খানাপিনা করো—আস্নান করো।

নরসিং কি ভাবলে। তারপর বললে—আমরা আজ কাল দুটো দিন এখানে থাকতে চাই। একটু জায়গা দেবেন থাকতে ?

শুখন নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকালে, তারপর একজন কর্ম্মচারীকে সে বললে—একঠো কামরা দে দেও সিং বাবুকে।

নিতাই বললে—পুকুর কোথা খোঁজ লেন, গাড়ীখানাকে ধুতে হবে তো !

রাম হাঁ ক'রে সব দেখছে। অবাক হ'য়ে গিয়েছে সে। ভয়ও পেয়েছে সে, শুখনরামের ভুঁড়ি দেখে, কানের চুল দেখে সে হি-হি ক'রে হেসেছে।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যার সময় নরসিং এসে বসেছিল—সেই তে-মাথার মোড়ে। নিতাই এবং রামও সঙ্গে আছে। তে-মাথার মোড়ের পাশে একটা গাছের তলায় এক পাঁইট মদ এবং খানিকটা মাংস নিয়ে বসেছে। নরসিং গম্ভীরভাবে সমস্ত দেখছে, নিতাই মধ্যে মধ্যে মদের গেলাস পূর্ণ ক'রে এগিয়ে দিচ্ছে। নরসিং গেলাস খালি ক'রে নিতাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বল্ছে—রাম।

রামের কাছে আছে মাংসের পাত্রটা। সে-ই মাংস পরিবেশন করছে ; হাড়ির ছেলে নিতাই মাংসটা ছুঁয়ে নেড়ে সিংজীর হাতে তুলে দিতে চায় না। বলে, আপনারা ছত্রি, বামুনের নিচেই আপনারা!

খানিকটা মাংস রাম দাদাবাবুর হাতে তুলে দিলে।

নরসিং বললে—নিতাইকে দে মাংস।

নিতাই বললে—পাকিয়েছে ভাল মাংসটা। ঝাল একটুকুন বেশি। তা—। হেসে বললে, এ মুখে ঝাল ভাল লাগে।

নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

নিতাই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—সিংজী।

নরসিং তার দিকে ফিরে চাইলে।

—কি ভাবছেন বলেন তো আপনি?

নরসিং আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বাদশাহী শড়কের উপর প্রসারিত ক'রে দিলে। ছ্যাকরা গাড়ী চলেছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ী চলেছে ; মানুষের সারি চলেছে। ছ্যাকরা গাড়ী আস্ছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ী আসছে, মানুষ আসছে পায়ে হেঁটে।

মদের নেশায় নরসিংয়ের মনে খানিকটা ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে। তার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সে রোজ সকালে ভাঁড়ার ঘরের দোরে বসে পিঁপড়ের সারি দেখত। বাড়ির যেখানে যত পিঁপড়ে সব সারি বেঁধে এসে ঢুকত ভাঁড়ার ঘরে, আবার বেরিয়ে যেত ছোট ছোট এক একটি দানা মুখে নিয়ে। ও ব্যাটাদের বুদ্ধি নাই, থাকলে উঠোন থেকে ভাঁড়ার ঘর পর্য্যন্ত যদি কেউ একটা পিঁপড়ের মোটর সার্ভিস খুলত—তবে খুব ভাল সার্ভিস চলত।

নিতাই আবার ডাকলে—সিংজী! নরসিং বললে—গাড়ী গোন গাড়ী, গোন, যা বলেছি তাই কর।

রাম ছ্যাকরা গাড়ী গুনছে। নিতাইয়ের গণনাশক্তি মন্থর, সে গুনছে টাপর-দেওয়া গরুর গাড়ী। পথের লোক গুনবার দরকার নাই।

নিতাই একটা সিগারেট সিংজীকে দিয়ে নিজে একটা নিলে, দেশলাই জ্বালিয়ে সিংজীকে এগিয়ে দিলে আগুন, নিজে ধরালে, বাক্সটা ছুঁড়ে দিলে রামকে। তারপর হঠাৎ বললে—একটি কথা আপনাকে বলব আমি।

নরসিং তার দিকে ফিরে তাকালে।

—অভয় দিচ্ছেন তো?

নরসিং প্রসন্নভাবে একটু হাস্লে।

নিতাই বললে—রাম, গরুর গাড়ীশুদ্ধ গুনবি। সিংজীর সঙ্গে ঝগড়া আছে আমার।

নরসিং আরও একটু হাস্লে।

নিতাই বললে—হাস্‌বেন না। নালিশ আছে আমার। সাংঘাতিক নালিশ। হ্যাঁ। সে বলে দিচ্ছি আমি হ্যাঁ। না বললে শুনছি না আমি।

গম্ভীর ভাবেই এবার নরসিং বললে সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর মত—বল। কি নালিশ তোর শুনি!

নিতাই বললে—বলব?

ব—ল। বলছি তো।

রাম বড় হয়েচে কি-না?

নরসিং বললে—বড় হল্‌ছে ওটা।

নিতাই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করার মত ঘাড় নেড়ে বললে—একশোবার। হাকিমের মত কথা। ফ্যাক—ফ্যাক—ফ্যাক। হেসেই আছে।

নরসিং বললে—তুই ওকে মদ দেবার কথা বলছিস, কিন্তু বেলেল্লাগিরি করবে ও। খুন ক'রে ফেলবো। খুন ক'রে ফেলবো। কি রে করবি বেলেল্লাগিরি?

রামা মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে, না, বেলেল্লাগিরি সে করবে না।

নিতাই চট ক'রে এক গেলাস মদ ঢেলে নরসিংকে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেন, পেসাদ ক'রে দেন।

নরসিং মদের গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু ভাবলে—তারপর বললে—নে, তাই নে। মদ তো খাবিই, আজ হোক আর কাল হোক। যার তার কাছে খাবি, তার চেয়ে আমার কাছেই খা। নে। মদের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরলে। নে-নে। লজ্জা নাই এতে। নে।

সলজ্জ ভাবেই রাম এগিয়ে এসে গেলাসটা হাতে নিলে এবং একটু মুখ ঘুরিয়ে গেলাসটা মুখে তুললে। কিন্তু বাধা দিয়ে নিতাই প্রায় গর্জ্জন ক'রে উঠল, এইয়ো। এই রামা। তর সইছে না। উল্লুক কাঁহাকা। লেও আগাড়ি গুরুজীকে পাঁওকে ধুলা লেও, প্রণাম কর বাঁদর!

লজ্জায় জিভ কাটলে রাম। এ বড়ই কসুর হ'য়ে গিয়েছে। সে প্রণাম করলে নরসিংকে, পায়ের ধুলো নিলে। নরসিং বললে—খবরদার, মদ খাবি কিন্তু মাতলামি করবি না।

পাঁইট বোতল; দুজনের জায়গায় তিনজন খানেওয়ালা জুটেছে, দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে গেল অথচ নেশা এখনও জমে নাই। সংসারটা নিতাইয়ের কাছে এখনও উদাস মনে হচ্ছে না। সেই বললে, গুরুজী। আর এক পাঁট আনি।

নরসিংয়েরও এখনও জমে নাই। মেঠো পথে গাড়ী চালিয়ে এসে শরীরের অবসাদ এখনও যায় নাই। সে রামের দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল ক'রে দেখে নিলে। নাঃ, রামা ঠিক আছে। ছোঁড়াটা সিদ্ধি খেয়ে হাসে, মদ খেয়ে গম্ভীর হয়েছে। হাজার হোক ছত্রির বাচ্চা!

গুরুজী!

হাঁ—আর এক পাঁট চাই।

নিয়ে আসি। নিতাই উঠল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নরসিং বললে, চল সবাই যাব। দোকানে বসে খাব। বস্ হিসেবটা ক'রে নি। রামা তোর ঘোড়ার গাড়ী ক'খানা?

ঘোড়ার গাড়ী? ক'খানা? রাম শঙ্কিত হ'ল, মদ খাওয়ার পর আর তার গুনতে মনে নেই।

নরসিং আবার প্রশ্ন করলে—গুনতে ভুলে গিয়েছিস বুঝি?

আট খানা পর্য্যন্ত গুনেছি।

গরুর গাড়ী?

নিতাই জবাব দিলে, সে এ্যানেক। চলছেই—চলছেই। কুড়ি পঁচিশ খানা তো খুব।

এতেই নরসিংয়ের হবে। এর চেয়ে সঠিক হিসেব সে কল্পনা করতে পারে না। চার আটে বত্রিশ, কুড়ি দুগুণে চল্লিশ। বত্রিশ আব চল্লিশে—বাহাত্তোর। হুঁ। নিতাইয়ের দিকে চেয়ে নরসিং বললে—চলবে। বুঝলি রে নিতাই। চলবে।

নিতাই হাসল পাকা সমঝদারের মত। হেসে বললে, সে আমি বুঝেছি। তেমাথায় এসে যখন গাড়ী গুনতে বলেছেন—তখুনই বুঝেছি। না বললেও বুঝে নিয়েছি। পাঁচ-মতী পর্য্যন্ত সারবিস?

নরসিং বললে—চল, এবার দোকানে যাই। শহরের সার্ভিসের বাস ট্যাক্সি সব এতক্ষণ এসে গিয়েছে। ড্রাইভারেরা সব ওখানেই আসবে। চল।

নিতাই হেসে বললে—পেরথমে আমি কি মনে করেছিলাম জানেন?

নরসিং ভাবতে ভাবতেই চলেছে, এ সব কথায় কোন আসক্তি নাই তার, কোন আকর্ষণ সে অনুভব করছে না। ভাবছে সে অনেক কথা। আট মাইল পথ; যাওয়া-আসা এক ট্রিপ ষোল মাইল। এক গ্যালন তেল। ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ার আট আনা। প্রথমে আট আনার চেয়ে বেশি ভাড়া করলে চলবে না। ন-আনাও চলতে পারে। মোটরে চড়ার ইজ্জৎ, তাড়াতাড়ি যাওয়া, আরামের জন্যে এক আনা দেবে না লোকে? পরক্ষণেই মনে হ'ল, না, দেবে না। প্যাসেঞ্জারদের অধিকাংশই কোর্ট প্যাসেঞ্জার। জমিদারের গমস্তা, মহাজনের কর্ম্মচারী, চাষী রায়ত, দেনদার গৃহস্থ। জন কতক কোর্টের কেরানীও আছে। বাড়িতে খেয়ে তারা ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। আধ পয়সার পান, আধ পয়সার বিড়ি কেনে; দু-পয়সার বেগুনী ফুলুরী কিনে ঠোঙায় নিয়ে চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে খায়। তারা কখনও এক আনা বেশি দেবে না। দেবে যখন নিরুপায় হবে, যখন ঘোড়ার গাড়ী আর থাকবে না, তখন দেবে। ঘোড়ার গাড়ীগুলোর সঙ্গে প্রথমে একবার লাগবে রেষারেষি। ওরা শেয়ারের দাম নামাবে। আট আনা থেকে সাত আনা—ছ আনা। চার আনাতেও নামতে পারে। তখন?

মনে পড়ে গেল মেজ বাবুকে।

মেজ বাবুই প্রথম মোটর বাস কিনে ইমাম বাজার থেকে জংশন ষ্টেশন পর্য্যন্ত সার্ভিস খুলেছিলেন। ছোট রেলের সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে বাস চালিয়েছিলেন। এই যাত্রী চালনা করার পদ্ধতি তাঁরই কাছে শিখেছিল নরসিং। পনের দিন নরসিং ষ্টেশনে গিয়ে প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রী সংখ্যা গুনে আসত। রেলকোম্পানীও বাস সার্ভিসকে জব্দ

করবার জন্য ভাড়া কমিয়েছিল, মেজবাবুও কমিয়েছিলেন। দরকার হয় সেও ভাড়া কমাবে।

নিতাই অনেকক্ষণ থেকে কথা বলবার জন্য উসখুস করছে। সে বললে—গুরুজী!

হুঁ।

খুব সরস করে নিতাই মৃদু স্বরে বললে—পেরথমে আমি কি ভেবেছিলাম জানেন? ভেবেছিলাম, মেয়েটার ওপর আপনার টান পড়ে গিয়েছে। সেই টানে বোধ হয় থেকে গেলেন।

নরসিং এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্ত্তে তার মন ঘুরে গেল, মনে পড়ে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটির মুখের আশ্চর্য্য হাসিটুকু চোখের উপর ভেসে উঠল। তার বিপত্নীক জীবনের উত্তাপ মুহূর্ত্তে যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভের অবরুদ্ধ উত্তাপের মত অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়ে তাকে চঞ্চল অস্থির করে তুললে। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললে—বোতলটা দেখি।

নিতাই বললে—না কিনলে তো নাই। চলুন দোকানে চলুন।

রাম এবার এগিয়ে এল। নরসিংকে শুনিয়ে নিতাইকে সে বললে—কাল আমি ঠিক সাওজীর বাড়ীতে ঢুকে পড়ব। মেয়েটাকে বলব—রাত্তিরে দরজা খুলে চলে এস। মোটর রেডী করে রাখব। বাস। মার পাড়ি। রামের সাহস বেড়ে গিয়েছে আজ, মাথা চন-চন করছে। দাদাবাবুর জন্য সে জান দিতে পারে আজ। আস্ফালন করে সেই কথাটা সে জানিয়েও দিলে—জান যায়—সে ভি আচ্ছা।

শহরের ভেতরে এসে পড়েছে তারা। নরসিং বললে, মেলা বকিস না রাম। চুপ সে চল। ব্যবসা আছে শহরটাতে। রবি ফসলের আড়ৎ। এ অঞ্চলের রবি ফসল এইখানে এসে জমা হয়, এখান থেকে চালান যায় দেশ-দেশান্তরে। বড় বড় গদীর সামনে অনেকটা পরিমাণে খোলা জমি, সেই খোলা জমিতে গরুর গাড়ীর ভিড় জমে গিয়েছে। গাড়ীর মুখ থেকে পিছন পর্য্যন্ত বস্তা বোঝাই। দোকানে পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে।

তারা এসে পড়ল মোটর বাসের ডিপোয়। এখানেও একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনে একটা সেড। সেই সেডের মধ্যে মোটর বাস রেখেছে পাঁচখানা। দুখানা ট্যাক্সি। এগুলো যায় সদর শহর পর্য্যন্ত। খুব লাভের সার্ভিস এটা। মোটরের দোকানটা নেহাৎ ছোট। আসল দোকান ওদের শহরে। এখানে কিছু পেট্রোল মোবিল রাখে মাত্র। বাকী যা দরকার হয় আনিয়ে নেয় শহরের দোকান থেকে। বৈকালে তেমাথায় যাবার আগে সে এখানে এসে দোকানের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গিয়েছে। ফ্যান বেল্টিংয়ের দরকারও ছিল, তারটা পুরানো হয়েছে, সেই উপলক্ষ্য ক'রে দোকানটা দেখে গিয়েছে বেশ ভাল ক'রে। এখনও সে আবার একবার দাঁড়াল।

নিতাইয়ের মন ছুটছে মদের দোকানের দিকে। সে তাগিদ দিয়ে বললে—বাজে দোকান, কিছু মেলে না। চলুন চলুন। ওদিকে আবার দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নরসিং অগ্রসর হ'ল।

মদের দোকানে শেষ আসরের ভিড় জমে গিয়েছে। দোকান বন্ধ হবে। নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভদ্রবেশী আসছে। অনেকে অবশ্য বেপরোয়া, আবরণের ধার ধারে না। গমস্তা, আমমোক্তারদের দেখলেই চেনা যায়। পকেটে ক্লিপ আঁটা পেন্সিল, কারও বা

সস্তা ফাউণ্টেন পেন, কাগজে নোটবুকে মোটা পকেট, কথাবার্ত্তার মধ্যে আইনের ধারা চলছে। নরসিং খুঁজছিল জামায় কাপড়ে কালি, গ্রিজ, মোবিলের দাগ—দোকানের মদেব গন্ধেও নিশ্বাস নিয়ে খুঁজছিল—মোবিল পেট্রোল মেশান—অতি পরিচিত বিচিত্র গন্ধ। ব্যাকব্রাস করা লম্বা রুক্ষ চুল ; রুক্ষ কঠিন মুখ, পাকানো গোঁফ খুঁজছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠিক খুঁজে বার করল সে পাঁচজনকে। আলাপ করবার পথ সহজ। প্রশ্ন করলে—সকালে মোটর কখন ছাড়ে বলুন তো ?

সাড়ে সাতটা।

ঠিক সাড়ে সাতটা ?

টাইম সাতটা পঁচিশ, তবে হয় সাড়ে সাতটা—পৌনে আটটা—শহরে ঘুরে প্যাসেঞ্জার নিয়ে সময় লাগে তো ?

এখানে ফ্যানবেল্ট পাওয়া যাবে কি-না বলতে পারেন ?

ফ্যানবেল্ট ? সবিস্ময়ে লোকটি তাকালে তার দিকে। ফ্যানবেল্ট নিয়ে—আপনি কি ?

আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি এখানে। নরসিং বললে—ইমামবাজার থেকে ভাড়া নিয়ে এসেছি।

বসুন-বসুন।

আপনারাও তো মোটর সার্ভিসে কাজ করেন ? হাসলে নরসিং।

বসল সকলে জমিয়ে। রসিদ মিয়া, জাফর সেখ, রামেশ্বর প্রসাদ, জীবন, তারক এরা ড্রাইভার। পাগলা, ন্যাড়া, ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এরা ক্লীনার। ক্রিশ্চান জোসেফ, সে এস-ডি-ও'র ড্রাইভার। জোসেফ রজনী দাস। সব চেয়ে তার জোসেফকেই ভাল লাগল। রসিদ জাফরদের সঙ্গে জোসেফের পার্থক্য থাকারই কথা। বাস-ট্যাক্সী ড্রাইভারে আর প্রাইভেট গাড়ীর ড্রাইভারে তফাৎ থাকবেই। তার উপর জোসেফ এস-ডি-ও'র ড্রাইভার, চারজন এস-ডি-ও পার করলে জোসেফ। মধ্যে একজন এস-ডি-ও ড্রাইভার সঙ্গে এনেছিলেন—তখন সে ডি-এস-পির কাছে কাজ করেছিল। জোসেফ খুব ভদ্র, মিষ্টি হাসি-মুখ—অথচ গম্ভীর। গেলাসের মদ সে অল্প অল্প করে খাচ্ছিল ; রসিদ জাফর এদের কিন্তু একটা গেলাস বড় জোর দু-চুমুক। রসিদ তারক এরা দুজনে মদ খেলেই মারপিট করতে চায়, ওদের কয়েকটা কথা শুনেই এবং হাতকাটা খাঁকী সার্টের হাতা না থাকা সত্ত্বেও—আস্তিন গুটানোর ভঙ্গিতে কব্জি থেকে কনুই পর্য্যন্ত হাতের উপর হাত বুলানো দেখেই নরসিং সেটা বুঝতে পারলে। জাফর গুম হয়ে বসে আছে। পথের জনতার দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লোক চলছে—জাফর দেখছে—কিন্তু দৃষ্টি নিরাসক্তির মধ্যেও স্পষ্ট একটা সন্ধানের লোলুপতা রয়েছে। সে খুঁজছে স্ত্রীলোক। সে কথা বুঝতে নরসিংয়ের এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। রামেশ্বর সব চেয়ে ভয়ানক। ঠোঁটের একটা দিক অনবরত টানা ওর অভ্যাস। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে নখ কাটছে। ওটা ও চালাতে অভ্যস্ত—এতে নরসিংয়ের সন্দেহ রইল না। জীবনটা ক্রমাগত অশ্লীল-অশ্রাব্য কথা বলে চলেছে।

রামেশ্বর নরসিংকে বললে—তাসের বাজী খেলবেন ? চলিয়ে না ?

লোকটা শুধু ছুরিবাজ নয়—জুয়াড়ীও। নরসিং উঠে পড়ল, না। আচ্ছা, রামরাম। সেলাম।

বেরিয়ে এল সে দোকান থেকে। জোসেফ সঙ্গে এসে বললে—ভাল করেছেন। লোক ভাল নয় রামেশ্বর। আপনি বিদেশী—

হেসে নরসিং বললে—বিদেশী নই। গিরবরজার সিং আমি। এখানে হাঁক দিলে আমারও বিশ আদমী বেরিয়ে আসবে।

গিরবরজা? গিরবরজার সিং আপনারা?

হাঁ। নরসিং একবার দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুইপ্রান্ত মুছে—উপরের দিকে ঠেলে দিলে।

জোসেফ বললে—আমাদের বাড়ী ছিল এক সময় গিরবরজা।

গিরবরজা বাড়ী ছিল? আশ্চর্য্য হয়ে গেল নরসিং।

আমার ঠাকুর্দ্দার বাবা এখানে এসে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ দাস। একটু চুপ ক'রে থেকে সে হেসে বললে—তিনি জাতে ছিলেন হাড়ি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নরসিং। তাদের গাঁয়ের হাড়িদের মনে পড়ে গেল। তাদের গাঁয়ের হাড়ির ছেলে এই জোসেফ।

জোসেফ সিগারেট বার করে নরসিংকে দিলে। নরসিং বাঁ হাতে জোসেফের ডানহাত খানা চেপে ধরলে। তার মনে হ'ল জোসেফ তার পরমাত্মীয়। হঠাৎ সে বললে—আচ্ছা বল দেখি—বলুন দেখি—এখান থেকে পাঁচমতী পর্য্যন্ত যদি সার্ভিস খুলি—তো চলবে কি-না?

পাঁচমতী? শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী?

হ্যাঁ।

হঠাৎ আপনার এ ঝোঁক হ'ল কেন? আপনাদের ইমামবাজার থেকে জংসন হ'য়ে সদর পর্য্যন্ত সার্ভিস তো খুব ভালো।

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফ বললে—রাস্তা ত মোটে আট মাইল—এইটুকু পথে—। ভাবতে লাগল জোসেফ।

নরসিং দাঁড়াল থমকে। বললে, এইখান থেকে ভাঙব আমি। ভেবে দেখবেন। কাল আবার দেখা করব।

জোসেফ প্রশ্ন করলে—রয়েছেন কোথায়?

শুখনরাম সাহুর গদীতে।

শুখনরাম সাহু?

হ্যাঁ।

জোসেফ একটু চুপ করে রইল—তারপর বললে, আচ্ছা কাল কথা হবে। আচ্ছা। নমস্কার।

রাম বললে—দেখুন কোথা থেকে আপন লোক বেরিয়ে গেল।

নরসিং আবার ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

নিতাইও যেন কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে—হাড়ির ছেলে?

উত্তর দিলে না নরসিং।

আটমাইল পথ মাত্র। সার্ভিসে অসুবিধা আছে। আট মাইল পথ লোকে হাঁটতে পারে, ঘোড়া গরু একটানে চলতে পারে। পথ যত দূর হয়—তত ওরা অপারগ হয়—কলের কদর তত বাড়ে। আটমাইল পথে ঘোড়ার গাড়ীর লাগে দেড় ঘণ্টা। নটার সময়

পাঁচমতী ছাড়লে সাড়ে দশটায় শ্যামনগর। মোটরে আধঘণ্টা। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী যদি ভাড়া চার আনায় নামায় তবে চার আনা পয়সার জন্যই লোকে ওই দেড়ঘণ্টা আগেই যাবে। তার চোখের উপর ভেসে উঠল বাদশাহী শড়ক। কত দূর চলে গিয়েছে। এই শড়কে বর্দ্ধমান জেলার দিকে গেলে রেললাইন পাওয়া যায় তিরিশ মাইল দূরে। কত যাত্রী, কত গাড়ী, কত মাল আসছে—যাচ্ছে। বিরাম নাই। তার যদি কলমের জোর থাকত তবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে কলমের খোঁচায় ঘায়েল ক'রে—এ রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করত। আর থাকত যদি টাকা, চারখানা বাস কিনবার পয়সা—তবে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতী হয়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সার্ভিস খুলত। সার্ভিস খুলবার কত লাইন পড়ে আছে। পথ নাই। রেলকোম্পানী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ তৈরী করে লাইন নিয়ে গিয়েছে হরিদ্বার পর্য্যন্ত, দিল্লী লাহোর পেশোয়ার পর্য্যন্ত, বোম্বাই পর্য্যন্ত, মাদ্রাজ পর্য্যন্ত ; সবশেষে হঠাৎ ভূগোলে পড়া কুমারীকা অন্তরীপ—রামেশ্বর তীর্থের কথা মনে পড়ল—রামেশ্বর পর্য্যন্ত রেললাইন নিয়ে গিয়েছে। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক চলছে। পথ থাকলে, টাকা থাকলে সে খুলত অমনি সার্ভিস শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে বোম্বাই।

নিতাই বললে—সিংজী ! এ লোকটা কিন্তু খুব চালবাজ বটে। হাড়ি থেকে খ্রীষ্টান হয়েছে কি-না, চালটা খুব মেরে গেল।

নরসিং বললে—না। ছোকরা লোক ভাল। ওর কাছে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

নিতাই বললে—বলুক মশায় ও। খুলে দেন সারবিস্ আপনি। হ্যাঁ।

নরসিং বললে—হ্যাঁ সার্ভিস আমি খুলব। যা থাকে কপালে।

কপাল আপনার ভালই। ভেবে দেখেন আপনি। রোজকার পাতি বন্ধ ক'রে বাড়ী যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে ভাড়া মিলে গেল। বিশমাইল পথ বড় জোর—ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এসে গেল। এ আপনার মা-লক্ষ্মী ডেকে এনে আপনাকে লাইন দেখিয়ে দিলেন।

কথাটা নরসিংয়ের মনে ধরল। নিতাই খুব ভাল বলেছে। কথাটা সে এমন ভাবে ভেবে দেখে নাই। ওখানকার এস-ডি-ও'র উপর নিস্ফল ক্ষোভে সে স্থির করেছিল, আর সে এই ছোট কাজ করবে না। ছোট কাজ, যে কাজে এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় সে ছোট কাজ ছাড়া আর কি ? সে ভেবেছিল, গাড়ীখানা বেচে দিয়ে পূর্ব্বের মজুত আর এই গাড়ীর টাকা নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে জমি কিনবে কিছু আর করবে মহাজনী। সুদের ব্যবসা। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছিল তার দিদিয়াকে। মা মরে গিয়েছে, জেঠারা মরেছে, দিদিয়া বুড়ী আজও বেঁচে আছে, তাকে মোটর গাড়ীটা দেখাবে, তাকে একবার চড়াবে গাড়ীতে এই বলেই সে গাড়ীখানা নিয়ে চলেছিল গিরবরজা। আরও দেখাতে ইচ্ছে ছিল তার ক্ষ্যাপা মাধবজেঠাকে, গ্রামের লোককেও দেখাতে ইচ্ছে ছিল। মোটরখানাই তো তার কীর্ত্তি! তাদের বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ কল্পনা ক'রে সে মনে মনে খুশি হয়েছিল।

পথে হঠাৎ ওই শুখনরামের গাড়ী উল্টে গেল। শুখনরামকে অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জিত করবার জন্যই সে পঞ্চাশটাকা ভাড়া হেঁকেছিল। শুখনরাম তাই দিয়ে তাকে নিয়ে এল। পথে আসতে আসতে তার চোখ খুলে গেল!

লক্ষ্মীমন্ত শুখনরাম। সেই মেয়েটি! ঠোঁটের কোলে সেই আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম হাসি ওই হয়

তো তার ভাগ্যলক্ষ্মী। ছেলেবেলায় দিদিয়ার কাছে গল্পে সে ভাগ্যলক্ষ্মীর কথা শুনেছে। রাজার ভাগ্যলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গে তাঁর মণি-মুক্তার আভরণ ঝলমল করছে, পরণে তাঁর সোনার সূতায় বোনা কাপড়, বিপদে সম্পদে রাজাকে এসে দেখা দিতেন। সে মোটর চালায়, সকাল ইস্তক রাত্রি পর্য্যন্ত দুনিয়া তার চারপাশে পাক খায়, গরমে তার হাঁটু থেকে পা পর্য্যন্ত ঝলসে যায়, পেট্রোলের গন্ধে কলিজা ভরে যায়, শীতের দিনের দরজা জানালা বন্ধ কেরোসিনের ধোঁয়ায় ভরা চোর-কুঠরীর মত, তার ভাগ্যলক্ষ্মী যদি ওই মেয়েটি হয়—তবে সেও তার জোর নসীব বলতে হবে। খুলবে সে সার্ভিস। শ্যামনগর পাঁচমতী ট্যাক্সী সার্ভিস। তারপর দেখা যাবে। ছোট নদীটা পার হ'য়ে বাদশাহী সড়ক ধরে—

বাজারের এ পথটা শেষ হল একটা চৌমাথায়। বাঁ দিকে তাদের পথ।

এ পথটা অন্ধকার। কাঠের আড়তে, কয়লা ডিপোতে কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বলছে, দোকানে হ্যারিকেন।

নরসিং বললে—বাতি কিনে নে নিতাই। ছুটো।

[ ক্রমশ ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

# রবীন্দ্রস্মৃতি ও সাহিত্যিক সমিতি

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য বাঙলা সাহিত্যিকরা 'রবীন্দ্রস্মৃতি সাহিত্যিক-সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রায় শত তিনেক সাহিত্যিক যথানিয়মে সমিতির সভ্য হয়ে গত ১৩ই আগষ্ট 'বিচিত্রা ভবনে' তার 'কর্মী-সংসদ' গঠিত করেন। পরে কর্মী সংসদের এক সভায় আবার বিভিন্ন কর্মতালিকার জন্য কয়েকটি শাখা-সংসদ গঠিত হয়েছে। এই সমিতির সভাপতি হয়েছেন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। তা ছাড়া কর্মী-সংসদের ও শাখা-সংসদের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে সকল দলের ও সকল মতাবলম্বী সাহিত্যিকরাই আছেন। সাহিত্যিকরা সাধারণভাবে স্থির করেছেন তাঁরা নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবের থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে 'রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডার'কে পুষ্ট করবেন। বিশেষ ক'রে তাঁদের চেষ্টা হবে সেই 'রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারের' কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত 'রবীন্দ্র পুরস্কারের' জন্য আগামী ২৫শে বৈশাখের পূর্বে একলক্ষ টাকা সংগ্রহ ক'রে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক-সমিতি এই কার্যতালিকা নিজ থেকে গ্রহণ করেছেন (১) রবীন্দ্র-অর্ঘ স্বরূপ নিজেদের শ্রেষ্ঠ রচনা একখানি গ্রন্থে গ্রথিত ক'রে তা প্রকাশ করা। এ গ্রন্থের খরচ বাদে সমস্ত আয়ই যাবে স্মৃতি-ভাণ্ডারে। একটি গ্রন্থন-সংসদ এ কাজের বিশেষ ভার গ্রহণ করেছে। (২) সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকাদের সহযোগে রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক অভিনয; তার আয়ও জমা হবে সেই উদ্দেশ্যে। এই জন্যও একটি অভিনয়-সংসদ নির্বাচিত হয়েছে। (৩) তা ছাড়াও অবশ্য সাহিত্যিকরা ব্যক্তিগতভাবে এবং নানা

সাহিত্য-সমিতির মারফতে যে ক'রে পারেন স্মৃতিভাণ্ডার পুষ্ট করবেন। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো লেখক তাঁদের এক-একখানি গ্রন্থের আয় এই উদ্দেশ্যে দান করেছেন।

বাঙলা সাহিত্যিকদের এই শুভ প্রচেষ্টা বাঙালী মাত্রই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে। আমরা প্রত্যাশা করব—প্রত্যেক ছোট বড় সাহিত্যিক তাঁদের এই সমিতিতে যোগদান করবেন এবং এই দায়িত্ব প্রতিপালনে সমিতির সঙ্গে যুক্ত হবেন। মোটামুটি ভাবে সমিতির গঠনে সকল মতবাদের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকই অংশ গ্রহণ করেছেন—এটি বিশেষ আনন্দের কথা। অবশ্য এরূপ না হলেই বিস্মিত হতে হ'ত। কারণ বাঙলা সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের ভাষার ও সাহিত্যের লেখক, এইটি তাঁদের পক্ষে পরম গৌরবের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ভাব, বাগ্‌ভঙ্গি জানা-অজানায় তাঁদের নিজস্ব হয়েছে, তাঁদের সৃষ্টিতে, চিন্তায়, ভাবনায় এবং দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথই সাহায্য জোগান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি কবির স্মৃতিরক্ষায় যদি তাঁরা সচেষ্ট না হতেন, কিংবা একত্রিত হতে না পারতেন, তা হলে লজ্জার ও কৃতঘ্নতার সীমা থাকৃত না। এখন কার্যত সমিতির প্রস্তাব সার্থক যাতে হয় সে জন্য তাঁদের যত্নপর হতে হবে।

সাধারণ বাঙালী হিসাবে আমরা অল্পাধিক জানি—কোনো কোনো সময়ে তাঁদের রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারের ব্যাপারে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সে সব দিকে নিশ্চয়ই ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষকেও অবিলম্বে যথোচিত আলোকপাত করতে হয়। সাহিত্যিকদের কর্তব্য হবে—জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ এদিকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা,—সাধারণের ভ্রান্তি থাকলে তা দূর করা, আর কর্তৃপক্ষকেও সেইসব প্রশ্ন ও ভ্রান্তির সম্বন্ধে অবহিত ক'রে প্রয়োজনমত দায়িত্বশীল ও সহনশীল ক'রে তোলা। কারণ, রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিকদেরও নিজস্ব সম্পত্তি নন; তাঁর স্মৃতিরক্ষা, স্মৃতিভাণ্ডার ও স্মৃতিপরিকল্পনা, সেই সম্পর্কিত উদ্যোগ-আয়োজন কোনো খ্যাতকীর্তি লোকদেরই নিজস্ব ব্যাপার মাত্র হতে পারে না—সেরূপ হতে দেওয়াও চলবে না। এ বিষয়ে সাধারণের সঙ্গে সাহিত্যিকরাও একমত—রবীন্দ্রনাথ জাতির, তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারও হবে জাতীয় দায়িত্ব—স্মৃতিভাণ্ডার পুষ্টির দিক থেকেও যেমন জনসাধারণ তার কর্তব্য আজ প্রতিপালন করছে, তেমনি পরিচালনার দিক থেকেও বরাবর জনসাধারণ তাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করবে।

স্মৃতিভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের একটু নিবেদন আছে। ভাণ্ডারের সম্পাদক নিজে যতটা উদ্যোগ ও তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছেন, কমিটির অন্যান্য সদস্যদের তেমন কোনো আগ্রহ জনসাধারণ জানতে পারে নি। আজ পর্যন্ত কমিটির কয়টি অধিবেশন হয়েছে, তাতে কতজন সদস্য ও কে কে উপস্থিত ছিলেন, কেন কোনো কোনো দিন কমিটির অধিবেশন স্থগিত হয়ে গিয়েছে,—এসব কথা সাধারণকে জানালে ক্ষতি নেই, বরং না জানালেই জনসাধারণের সংশয় থেকে যায়। এমন কি, কমিটির যে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার কথা কাগজে ঘোষিত হয়েছে, তা যতই সুন্দর হোক, সে সম্পর্কেও বিচার বিবেচনার অধিকার জনসাধারণেরই রয়েছে কারণ, এ দিকেও শেষ দায়িত্ব জাতিরই, কর্মকুণ্ঠ বা কর্মতৎপর ব্যক্তিবিশেষের নয়।

# "গণতান্ত্রিক বিজয়"

'গণতান্ত্রিক বিজয়'—কথাটি রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের। তিনি ভারতবর্ষের মনের আশা ও নৈরাশ্যকে প্রকাশ করেছেন তাঁর যুদ্ধান্তের বাণীতে : "এই গণতান্ত্রিক বিজয় হইতে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন যে কোনো ফললাভ করে নাই,—এই কথা দুনিয়া ভুলিতে পারে না। মানব সমাজের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এখনো স্বাধীন জাতির মর্যাদা পায় নাই। যতদিন পর্যন্ত ভারত অন্যান্য রাষ্ট্রের সমমর্যাদা লইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষমতা না পায়—ততদিন কোনো শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইবে না।"

তবু এই গণতান্ত্রিক বিজয়ে ভাবতবর্ষের গৌরবের কারণ আছে। রাষ্ট্রপতি তা সংযত গর্বের সঙ্গে গোড়াতেই নির্দেশ করেছেন :

"প্রতিবাদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা এই কথা ঘোষণা করিতে চাই যে, জাতীয়তা-বাদী ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম এই ফ্যাশিজম্, নাৎসিজম্ ও জাপ জঙ্গীবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিমত পোষণ করিয়াছিল। তখন মূল মিত্রশক্তিবর্গ বরং ফ্যাশিস্তদেব প্রচুর উৎসাহ জোগাইয়াছেন। তাই আজ প্রতিক্রিয়াশীল ও আক্রমণকারী শত্রুসমূহের দমনে, মানব-সমাজে গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গের বিজয়ে সন্তোষ প্রকাশ করিবার ও অভিনন্দন জানাইবার প্রথম গৌরব ভারতেরই ন্যায্য প্রাপ্য।"

এই দাবীই আমাদেরও। ভারতবর্ষের এই মূলনীতি বিভ্রান্তির দিনেও আমরা বিস্মৃত হই নি—যে দিন নেতারা ছিলেন অবরুদ্ধ, উপনেতাদের মুখে মুখে রটিত হ'ত টটেনহাম-ম্যাক্সওয়েলের সূত্র—'জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ জাপ জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে'—তখনো রাষ্ট্রপতির ব্যাখ্যাত এই গণতান্ত্রিক যুদ্ধ-নীতিতে আমরা বিশ্বাস হারাইনি, এবং সময়ে ও অসময়ে এই বিশ্বাসের জন্য দামও দিয়েছি। আজ তাই নিজের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা বোধ করি, যেমন বোধ করি ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা—কংগ্রেস কোনো দিন মূলনীতিতে ভুল করে নি।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। এ যুদ্ধের পরিণতি এইরূপই হবে অন্তত ১৯৪১-এর ২২শে জুনের পরে তা গণতন্ত্রীদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব ছিল না। পার্ল হার্বারের পরে, মার্কিন গণতন্ত্রকে মিত্রপক্ষের স্বপক্ষে যুদ্ধে টেনে নামানোর ফলে, সেই কথা নিছক সামরিক হিসাবেও পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছিল। তবু অনেক কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী বুদ্ধিজীবীদের এদিকে যে বুদ্ধি ও দৃষ্টির অক্ষমতা দেখেছি বরাবর তার কারণ, তাঁরা জঙ্গীবাদীদের দাপটে ও প্রভাবে আস্থা স্থাপন করেছিলেন ফ্যাশিস্তদের অস্ত্রশক্তির উপর, জঙ্গীবাদের উপর; তাঁরা আস্থা রাখেন নি জনশক্তির উপরে, গণতন্ত্রের যোগ্যতায়।

যারা জাপানের জয়ে বিশ্বাসী ছিল, এমন কি, হয়ত কার্যত জাপানের সঙ্গে যোগদানও করেছে, তারাও হয়ত কেউ কেউ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাইত। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি কংগ্রেসের স্বাধীনতাবাদে ও বৈদেশিক নীতিতে, আর তারা বিশ্বাস করত না দেশের বা বিশ্বের জনশক্তিতে। বিশেষ ক'রে এ যুদ্ধে জনশক্তির যে সম্ভাব্য অগ্রগতির পথ খুলে যায় ১৯৪১-এর ২২শে জুন থেকে—এই কথাটি ছিল তাদের পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য।

জনশক্তিতে এই আস্থার অভাবেই তখনকার দিনে তারা যুদ্ধের স্বরূপও বুঝতে অসমর্থ হয়েছে, আর যুদ্ধের সামরিক গতিও বুঝতে চায় নি। এবং জনশক্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবেই যুদ্ধাবসানেও তারা যুদ্ধের পরিণতিকে সঠিক বুঝতে অস্বীকৃত হবে—মান্‌তে চাইবে না মৌলানা আজাদের কথিত এই গণতান্ত্রিক বিজয়।

সত্যই গণতন্ত্রের জয় হয়েছে কি ?

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ৮ই মে, তারপরে পট্‌স্‌ডামে তার শান্তিপর্বের ভূমিকাও রচিত হয়েছে। বিশদ ক'রে তার আলোচনা এখানে অসম্ভব—যদিও জানি স্বল্প কথায় পাঠক সাধারণের মনের সংশয় বৃদ্ধিই পায়, দূর হয় না। ইউরোপের যুদ্ধের সামরিক হিসাবেও আমরা দেখেছিলাম—শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের নিকট ফ্যাশিস্ত ও নাৎসিশক্তির চূড়ান্ত পরাজয়। এই পরাজয়ে মার্কিন গণতন্ত্রের উৎপাদন-শক্তি বহুলাংশে কার্যকরী হয়েছে ; কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ইউরোপে ফ্যাশিজম্‌ ও জার্মান জঙ্গীবাদ চূর্ণ হয়েছে সোভিয়েট শক্তির আঘাতে ও প্রেরণায়। সেই জনরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে ও প্রেরণাতেই ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনশক্তি জাগ্রত হবার সুযোগ পেল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে গণতান্ত্রিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হ'ল। এবং অবশেষে যখন যুদ্ধশেষ হ'ল তখন ইউরোপ জুড়ে দেখা গেল ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তিদের দেশে দেশে প্রাধান্য।

তাই ব'লে ইউরোপে জনশক্তি নিষ্কণ্টক হয়েছে, তা নয়। হিটলারবাদের অবসানে ইউরোপের জনশক্তি জয়ের পথে প্রধান দু'টি সোপান উত্তীর্ণ হয়েছে—প্রথমত, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে প্রায় সর্বত্র, দ্বিতীয়ত তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচণ্ডতম অংশকে উচ্ছেদও করেছে বহু স্থলে। তবু প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি এখনো রয়েছে পুরনো স্পেনে, পর্তুগালে। নূতন ক'রে তার ঘাঁটি বাঁধবার চেষ্টাও চলেছে গোপনে গোপনে অন্য সর্বত্র, বিশেষ ক'রে গ্রীসে, বেলজিয়ামে, ইতালিতে এবং যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার জনশক্তির বিরুদ্ধেও। কিন্তু দিনে দিনে যে জনশক্তিরই বলবৃদ্ধি হ'চ্ছে তা দেখা যায় পোল্যাণ্ডের ব্যবস্থায়, ফ্রান্সের অবস্থায়। এদিকেই দ্বিতীয় প্রমাণ পট্‌স্‌ডামের মীমাংসা। তাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রয়াস ব্যর্থ ক'রে সোভিয়েট ব্যাখ্যাত গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিই জার্মানী সম্বন্ধে গৃহীত হ'ল : জার্মান জাতকে খণ্ড খণ্ড করা হবে না ; তার গণতান্ত্রিক দলগুলোর গঠনে বাধা দেওয়া হবে না ; জার্মানি তার সমর-শিল্পকে শান্তি-শিল্পে পরিণত করলে জীবন-যাত্রার প্রয়োজন মত শিল্প-গঠনের তার সুযোগ থাকবে। জার্মানিকে 'কৃষির দেশে' পরিণত করা হবে, মার্কিন শাসক মর্গেনঠাউ-র এই নীতি পট্‌স্‌ডামে গৃহীত হয় নি। পট্‌স্‌ডামের সিদ্ধান্তের ঐরূপ অপব্যাখ্যা করেছে রয়টারের কূটনীতিক প্রতিনিধি, এটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয়।

ইউরোপের জনশক্তির তৃতীয় বিজয় সূচিত হ'চ্ছে ব্রিটেনে চার্চিলের পরাজয়ে এবং লেবর পার্টির জয়ে। তার সাধারণ অর্থ আমরা পূর্বেই বুঝে নিয়েছি। বেভিন্‌ সাহেব

যতই চার্চিলের বৈদেশিক নীতির জের টেনে চলুন, সাধারণ শ্রমিক সদস্যের চাপ তাঁকেও মান্‌তেই হবে। তার ফলে অন্তত এখন থেকে ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রভাব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সে সব দেশের জনশক্তির বিরুদ্ধে ও শোষকদলের স্বপক্ষে প্রযুক্ত হবে না; এবং ইউরোপের পক্ষে যুদ্ধান্তে শান্তি ও প্রগতি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হবে। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ যদি শান্তি ও প্রগতি চায়, তা হ'লে পৃথিবীতেই আজ শান্তি ও প্রগতির অনেক বাধা দূর হ'য়ে যায়।

তথাপি এই কথাটি মনে রাখা দরকার—ইউরোপে গণতান্ত্রিক বিজয় শুরু হয়েছে, তা সম্পূর্ণ হয় নি। আসলে গণতান্ত্রিক বিজয় সম্পূর্ণ হ'লে গণতন্ত্র পরিণত হ'য়ে যায় সমাজতন্ত্রে। তবে সমাজতন্ত্রের সূচনাও যুদ্ধান্তে স্পষ্ট হ'চ্ছে, কিন্তু এখনো তা সূচনা—গণতান্ত্রিক জয় আরম্ভ হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ হয় নি।

ইউরোপের বেলা গণতান্ত্রিক জয় যতটুকু স্পষ্ট হয়েছে এশিয়ার বেলা জাপানী পরাজয়ের পরেও কিন্তু সেই জয় ততটা নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে নি। তার কারণ প্রধানত দু'টি। প্রথমত, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শক্তিরা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে নি। এশিয়ায় তারা নিজেদের তাঁবেদার জাতি ও দেশ রাখতে চায় স্বার্থের বশে, ঔপনিবেশিক শোষণনীতি তারা এখানে বর্জন করতে নারাজ। ইংরেজ হংকং ছাড়তে চাইবে না, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার চেষ্টায় নানা বাধার সৃষ্টি করবে। ফ্রান্স ইন্দো-চীনের সাম্রাজ্য ছাড়বে না। ওলন্দাজরা জাভায় ফিরে আস্‌তে চাইবে। এমন কি সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় মিকাডোর মত প্রতিক্রিয়াত্মক শক্তিসমূহকেই বরং জীইয়ে রাখতে চাইবে, জাপানেও জনশক্তির উদ্বোধন চাইবে না। সর্বোপরি মার্কিন শোষণধর্মীরা চাইবে সামরিক গুরুত্বের নামে ও বাণিজ্যস্বার্থের তাগিদে পূর্ব এশিয়ার উপর নিজেদের বাণিজ্য-সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। এ সব ছাড়াও এশিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাধা আছে। তা হ'ল এই যে, এশিয়ায় গণতান্ত্রিক বনিয়াদ সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি, অর্থাৎ এই যুদ্ধকালেও এশিয়ার জনশক্তি যুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে পারেনি, নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি,—ইউরোপের জনশক্তির মত প্রস্তুত হ'য়ে উঠতে পারেনি যুদ্ধাবসানের মুহূর্তের জন্য। চীন, ভারতবর্ষ, জাপান, ইরান, জাভা, বর্মা—এই সব জনাকীর্ণ দেশের বিপুল জনশক্তি তাই এখনো অল্পাধিক দুর্বল।

এশিয়ায়ও তবু শুভলক্ষণ একেবারে যে নেই তা নয়। প্রথমত, জাপানী জঙ্গীবাদের পরাজয়ও একটা বড় সৌভাগ্য এশিয়ার জাতিদের পক্ষে, বিশেষ ক'রে চীনাদের পক্ষে। দ্বিতীয়ত, এই আট বৎসরের যুদ্ধে চীনে অভাবনীয় স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা জেগেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে চীনের জঙ্গী-জমিদারীতন্ত্রের বিরুদ্ধে য়িনানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নয় কোটি চীনবাসীর এক গণতান্ত্রিক শক্তি। চিয়াং কাইশেক মার্কিনী সাহায্য নিয়ে তা ধ্বংস করতে চাইতে পারে, কিন্তু গণতান্ত্রিক চীন ধ্বংস হবে না—কারণ য়িনানের জনশক্তি যথেষ্ট সচেতন। তৃতীয়ত, ফিলিপিনোতে ম্যাক্ আর্থার প্রগতিশীলদের দমন করলেও সম্ভবত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। চতুর্থত, ইরানের অভ্যন্তরেও সোভিয়েট প্রেরণায় আজ গণতান্ত্রিক সূচনা দেখা দিয়েছে। পঞ্চমত,—আর তাই বড় কথা,—প্রতিশ্রুতি মত

৫

সোভিয়েটশক্তি জাপযুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় বহির্মঙ্গোলিয়ার গণরাষ্ট্র এবার স্বীকৃত হবে, এবং সম্ভবত কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে সেই সব অঞ্চলের গণশক্তি সুগঠিত হ'তে পারবে। অবশ্য জাপ যুদ্ধাবসানের প্রধান ঘটনাই এই—জাপ যুদ্ধে সোভিয়েটের পদার্পণ। সামরিক হিসাবেও তাতেই জাপানীদের আত্মসমর্পণ সুনিশ্চিত হয়। কারণ, আণবিক বোমায় জাপান বিধ্বস্ত করলেও সম্ভাবনা ছিল জাপ কোয়াণ্টুং বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় চীনে যুদ্ধ চালাতে পারবে। 'লালঝাণ্ডা বাহিনী' সেই সম্ভাবনা একবারে ধ্বংস করেছে এক মুহূর্তেই। কিন্তু রাজনীতিক হিসাবেই সোভিয়েটের যোগদানে এশিয়ার এক নূতন সম্ভাবনার উদয় হ'ল—ইউরোপীয় ও মার্কিন ধনিকতান্ত্রিক চক্রান্তের পক্ষে এবার আর এশিয়াকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করবার পুরোপুরি সুযোগ রইল না। সোভিয়েট শক্তি এশিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতার ব্যবস্থায় কথা বলবার অধিকারী হয়েছে; সে কথা বলবে অন্তত সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সনদের ভাষায় (তার সনদে ঔপনিবেশিক দেশেও "স্বায়ত্ত-শাসন" লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য সোভিয়েট বলেছিল—এই লক্ষ্য হোক স্পষ্ট স্বধীনতা)। এশিয়ার সেই ভাবী শান্তি-সম্মেলনের বৈঠকে আবার শোনা যাবে হয়ত মোলোটভের শাণিত সুস্পষ্ট উক্তি—সকল এশিয়াবাসীর মুক্তি চাই।

কিন্তু কথা হ'ল ভারতবর্ষের আমাদের পক্ষে জয় হয়েছে কি? হ'লেও বা, তা হয়েছে কি অর্থে? দেখছি—বর্মীরা বরং তাঁদের ফৌজ গড়েছে, একত্রিত হয়েছে; কিন্তু ভারতবর্ষের জনশক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে নি। যুদ্ধান্তে আজ তার বিভেদ উগ্রতর হ'য়ে আমাদের আরও দুর্বল ক'রে ফেলেছে। গণতান্ত্রিক বিজয়ের পথে প্রথম ধাপেও আমরা উত্তীর্ণ হ'তে পারি নি; তা পারলে, আমাদের হাতে থাকৃত আজ 'জাতীয় সরকার'; তা হ'লেই এই যুদ্ধ বিজয়ে আমরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হ'তে পারতাম সম্মুখে নতুন বিজয়ের দিকে। কাজেই, ভারতবর্ষের কথা ভাবলে আমাদের আজ মনে হয়—"গণতান্ত্রিক বিজয়ে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন ফললাভ করতে পারে নি।" কিন্তু তবু বিজয়ের সুযোগ যে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাও একই সঙ্গে স্মরণীয়। কারণ আমাদের জনশক্তির অনুকূলে আছে সমস্ত আন্তর্জাতিক অবস্থা—সোভিয়েটের সহানুভূতি, চার্চিল-বিজয়ী ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সদিচ্ছা, মার্কিন গণ-তান্ত্রিকদের আশা ও কামনা, আর চীনা স্বাধীনতাবাদীর সমর্থন। সাম্রাজ্যবাদ নিঃশেষ করবার উপযোগী এমন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আমাদের পক্ষে আর কোনো দিন ঘটে নি—তার অর্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জয়-পথ আজ প্রস্তুত হ'য়ে আছে। তাই, আজকের আমাদের নিজস্ব অনৈক্য ও অকর্মণ্যতায় এ সুযোগ হারালে পৃথিবীর নিকটেও তার মার্জনা নেই। কারণ আমরা স্বাধীন না হ'লে পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ ও অশান্তির এক কেন্দ্র হ'য়ে থাকবে ভারতবর্ষ—গণতান্ত্রিক বিজয়ে আমরাই হ'য়ে থাকৃব বাধা।

শুধু তাই নয়—আমাদের নিজেদেরও দুর্ভাগ্য এখানে আরও বহুগুণ হ'তে থাকৃবে। জনশক্তির সংগঠনের অভাবে এই যুদ্ধকালে আমাদের সামাজিক আর্থিক সকল ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, আমরা তা দেখেছি। জাপানী যুদ্ধ শেষ হ'ল শুনে তাই আজ আমরা সর্বাগ্রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। ভাবছি—'বাঁচলাম, হয়ত এবার চাল পাব, ডাল পাব, কাপড় পাব, বাড়িতে ঠাঁই পাব, গাড়ীতে জায়গা পাব।' কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন দায়িত্বহীন

ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কোনো যুদ্ধান্তের পরিকল্পনা নেই; যদৃচ্ছা তারা এখনি তাদের শানানো ছাঁটাই'র ছুরি চালাবে আমাদের গলায়। এখনি কারখানার মজুর ছাঁটাই হ'তে চলেছে লাখে লাখে; আফিসে কারখানায় শিক্ষিত কেরানী ও কারিগর ছাঁটাই হবে সহস্রে সহস্রে,—এক আর্থিক অরাজকতায় আমাদের ভাঙনমুখী জাত একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে যাবে, যদি আজ আমাদের নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, জনশক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'যে নিজের দাবী আদায় করতে না পারে—দায়িত্ব প্রতিপালন করতে ভারতবর্ষ অগ্রসর না হয়।

রাষ্ট্রপতি ঠিকই বলেছেন, গণতান্ত্রিত বিজয়ের স্বচনা হয়েছে পৃথিবীতে—কিন্তু ভারত তবু কই?

গোপাল হালদার

# সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের মূল কথা

[এই প্রবন্ধেব লেখক একজন মার্কিন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসাবে তিনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনেব যে সব সংবাদ আমবা পড়েছি, তাব পিছনকার চিত্র জানা থাক্‌লে সেই সংবাদগুলো বুঝতে আবও সুবিধা হয়। লেখকেব উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সহজ পশ্চাৎপট ও সম্মেলনেব শক্তিমূল নির্দেশ করা। সম্পাদক, পবিচয়।]

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে যে সম্মেলন হ'য়ে গেল, ইতিহাস সম্ভবত এই সম্মেলনকে শান্তি এবং সাধারণ লোকের উন্নতির পথে মস্ত বড় একটা পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করবে। সম্মেলনে কতটুকু কি করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার আগে, যে শক্তিপুঞ্জ এই সম্মেলনকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল, সেই শক্তিগুলির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তা যদি করা হয় তা হ'লে দেখা যাবে যে, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং সম্মিলিত জাতির জনমতই হ'চ্ছে এই শক্তির উৎস।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের মার্কিন প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভ্য কমাণ্ডার হ্যারল্ড স্ট্যাসেন এক সাংবাদিক সভায় বলেন, "জনমতই এই সম্মেলনের জন্মদাতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এই জনমতের উপরই নির্ভর করছে।"

জনমত বল্‌তে আমরা বুঝি অনেকটা নীহারিকাপুঞ্জের মত এক শক্তিকে। সাধারণ মানুষের পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা এই শক্তি গড়ে ওঠে। জনমনের গতিপ্রকৃতির উপর সংবাদপত্র এবং বেতার-মন্তব্য গভীর দাগ এঁকে দেয়। যুদ্ধের ঘাত প্রতিঘাতে সাধারণ লোকের, বিশেষ ক'রে মার্কিনদেশের জনসাধারণের, দৃষ্টিভঙ্গিতে এক লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এসেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ইতিহাসেই একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তা হ'চ্ছে আমেরিকার বাইরের বিরাট বিশ্বের ঘটনাবলী এবং অবস্থার প্রতি মার্কিনবাসীর সাধারণ ও স্বাভাবিক ঔদাসীন্য। এর প্রধান কারণ এই যে, নিজেদের উন্নতি করবার উপযোগী বিরাট এক দেশ আছে আমাদের এবং এই আত্মনির্ভরশীল দেশে নিজেদের বিকাশ এবং বিস্তার করবার যথেষ্ট সুযোগও আমরা পাচ্ছি। বাইরের পৃথিবীর উপর আমরা

নির্ভরশীল নই, তাই বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতি অতিরিক্ত ব্যক্তিগত উৎসাহ বোধ করবার ঝোঁকও আমাদের ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর উড্রো উইলসন যখন ইউরোপীয় রাজনৈতিক্ নেতৃবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র "বিশ্বজাতি-সংঘকে" সমর্থন করবে তখন তিনি মার্কিনবাসীর এই রাজনৈতিক ঔদাসীন্যের কথা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই মার্কিন জনসাধারণই তাদের প্রেসিডেন্টের সেই বৈদেশিক-নীতি অস্বীকার করে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান পার্ল হার্বার আক্রমণ করলে মার্কিন জনমতের এক সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে। গণতান্ত্রিক নিয়মে আমাদের জীবনযাত্রা চলে। প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট এবং অন্যান্য দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ ফ্যাশিজম্‌কে সেই জীবনপথের পরম শত্রু বলে চিনতে পেরে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন্ ক'রে বক্তৃতাদি দিতেন। তার চেয়েও গভীরভাবে মার্কিনবাসীরা পার্ল হার্বারের ফলে বুঝল সারা বিশ্বে পরস্পরের প্রতি কত নির্ভরশীল আমরা।

আজ সাধারণ মার্কিনবাসী আন্তর্জাতিক-সহযোগিতার নীতি সমর্থন করে। মার্কিন-বাসী বুঝতে পেরেছে যে, দুই মহাসাগরের আড়ালে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা সম্ভবত ভুল; কারণ জাপান প্রমাণ করেছে, মহাসাগরকে প্রশস্ত রাজপথেও পরিণত করা সম্ভব। মার্কিন জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, বালির মধ্যে মাথা গুঁজে থাক্‌লে যদি বা মাথা বাঁচে দেহটা বাইরেই থাকে—আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।

জাতীয় স্বাধীনতার চেয়েও পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতার নীতিই এখন আমেরিকার জনসাধারণ গ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে যখন সম্মিলিত জাতি-সম্মেলন হ'ল তখন মার্কিনবাসীদের প্রবল সমর্থন পাওয়া গেল। যখন চিন্তা করা যায় যে পৃথিবীতে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন সেই যুক্তরাষ্ট্রের সুগঠিত জনমতের এই আত্মপ্রকাশকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই মেনে নিতে হয়।

জনমত শুধু সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনকে যে সম্ভব করেছে তাই নয়, জনমত এই সম্মেলনকে যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান এবং তার বিলোপ সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নইলে ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আত্মরক্ষার দুর্ভাবনায় আবার ব্যস্ত হ'য়ে পড়ত।

মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এই শিক্ষালাভ করেছি যে, "স্থিতিশীল আত্মরক্ষা" ব্যবস্থা করলেই যে যুদ্ধের বিলোপ সাধন করা যায়, তা নয়। তাই এপ্রিল মাসে সান্‌ফ্রান্‌-সিস্কোতে সম্মেলন যখন শুরু হ'ল তখন অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধিই জোর দিয়েছিলেন নিরাপত্তা পরিষদ (সিকিউরিটি কাউন্‌সিল) গঠনের উপর—পরিষদের পিছনে অবশ্য চেয়েছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক হিসাবে "বৃহৎ পঞ্চশক্তির" সমর্থন।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, বেতার বক্তৃতা, এবং জনমতের বিবিধ অভিব্যক্তি—এ সবের সকলেরই প্রভাব পড়েছিল সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে। প্রতিনিধিরাও অবিলম্বেই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী কার্য-সূত্র হিসাবে তার "অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্‌সিল" গঠন বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হন।

একথা তাঁরা স্বীকার করেন যে, জাপানের পরাজয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বড় গোছের আর একটা বিশ্ব-সমর বাধবার বিপদ বিশেষ নেই; কিন্তু বিশ্বের সামনে বড় সমস্যা হ'চ্ছে অজ্ঞানতা, অনাহার এবং রোগভোগ। এইসব বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই "অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্‌সিলের" প্রয়োজন।

এ সমস্তর ভিতর মার্কিন জন-মনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রতিনিধিরা সকলে মার্কিন মুলুকে জমায়েৎ হয়েছিলেন, কাজেই সে দেশের জনমতের দ্বারা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। সম্মেলনে বার বার এই কথাটির উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয় যে, দারিদ্র্যই যদি স্থায়ী হয় কোথাও, পৃথিবীতে স্থায়ী উন্নতিও তবে হ'তে পারেনা কোথাও।

এই সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের মূল ধারণা ছিল এই সব। তা যখন স্থির হ'ল তখন সম্মেলন পরিণত হ'ল কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কমিটি মিটিং-এ। সেই সমস্ত সংসদে প্রতিনিধিরা প্রতিদিন গড়পড়তায় বারো ঘণ্টা ক'রে আলোচনা করেছেন—অনেক সময় গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা চলত।

দিনকে দিন সেইসব আলোচনার বিষয় এবং সিদ্ধান্ত রিপোর্ট করা সহজ কথা নয়। কারণ আসল কাজ করা হ'ত, প্রকৃত "সংবাদ" তৈরী হ'ত ঐ সব সংসদে; আর জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের কাছে তা প্রকাশ করা নিয়ম নয়। ফল হয়েছে এই যে, সভাশেষে প্রতিনিধিরা যখন বাইরে আসতেন তখন সাংবাদিকরা তাদের যার যে মুরুব্বি সেই প্রতিনিধির কাছে সভার কার্য-বিবরণী জানতে চাইতেন। কিন্তু মানুষের স্মরণশক্তি এমনই জিনিস যে, প্রত্যেক প্রতিনিধিই পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধ'রে তাঁদের সংসদে কে কি বলেছেন, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর রিপোর্টে কেন বারবার কেবল "সংকট" ও "অচল অবস্থার" সংবাদই পাওয়া গিয়েছে।

সম্মেলনের এক প্রধান সমস্যা হ'য়ে উঠেছিল ভাষা সমস্যা। প্রথমেই স্থির হয় যে, ইংরাজী, ফরাসী, স্পেনীয়, চীনা এবং রুশ ভাষা—সব কয়টি ভাষাই সরকারী ভাবে স্বীকৃত ভাষা। কোনো ভাষাকেই অন্য ভাষার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে না, এবং কোনো ভাষার দলিলই অন্যভাষার থেকে অনুবাদমাত্র বলে গণ্য হবে না। প্রত্যেক ভাষার দলিলই হবে মূল দলিল, সাঁচ্চা দলিল ব'লে গ্রাহ্য। ভবিষ্যতে যাতে বিশ্ব সনদের রুশ বা চীনা ভাষ্যও অন্য যে কোন ভাষার ভাষ্যের মত সমান প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার করা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়।

এর আগে কখনও চীনা অথবা রুশ ভাষা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যবহৃত হয় নি। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো আলোচনার জন্য চীনাদের দুই হাজার নতুন অক্ষর এবং যুক্তাক্ষর (Character Combination) তৈরী করতে হয়েছিল। তেমনি আবার চীনা ভাষার মত রুশ ভাষায় ইংরাজী 'দি' (The) শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই। এতে বেশ জটিলতার উদ্ভব হয়। একটা কমিটি-সভায় 'দি' (The) কথার অর্থ নিয়ে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক চলে। সেই সংসদ সনদের (Charter) একটা অংশ প্রস্তুত করছিলেন এবং প্রস্তাবিত ভাষায় বলা হয়েছিল, "Reports shall be submitted by the members of the organisation" ("প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ রিপোর্ট পেশ করবেন")। কয়েকজন ইংরাজী-

ভাষী এতে আপত্তি ক'রে বলেন যে 'সভ্য', "The members", কথাটায় সমষ্টিগত ভাবে সকল সভ্যদের বোঝাবে? না, ব্যষ্টিগতভাবে একজন দুইজনকে বোঝাবে? শব্দকোষ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা গবেষণা করার পর জনৈক সোভিয়েট প্রতিনিধি উঠে বললেন যে, এতক্ষণ ধ'রে যে আলোচনা হ'ল তা নিতান্তই পণ্ডিতী গবেষণা। কারণ, রুশ ভাষায় 'দি' (The) শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই!

শেষ পর্যন্ত ইংরাজী, ফরাসী এবং স্পেনীয় ভাষার খসড়ায় "দি" শব্দটি রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয় যে, তলায় একটা 'ফুট্ নোট' দিয়ে আসল উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দেওয়া হবে; এবং এই শব্দটি প্রয়োজনের তাগিদেই যে চীনা ও রুশ ভাষায় লিখিত সনদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাও জানিয়ে দেওয়া হবে।

শেষে যখন সনদটি তৈরি হ'য়ে গেল তখন প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে ডেকে পাঠানো হ'ল প্রত্যেকটি ভাষায় লিখিত সনদের প্রত্যেকটি শব্দ অনুমোদনের জন্য। কারণ ভবিষ্যতে প্রত্যেক প্রতিনিধিমণ্ডলীই এই পাঁচটি ভাষায় লিখিত সনদের প্রত্যেকটি সংস্করণের জন্য সমান দায়ী থাকবেন। এতে অনেক দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলী বেশ মুস্কিলে পড়ে যান নিজেদের বিশ্বস্ত রুশ ও চীনা ভাষায় অনুবাদকারী তাঁরা কোথায় পাবেন কাছাকাছি? তেমন অনুবাদকারী না পেলে এই খসড়াগুলোকে অনুমোদন তাঁরা করবেন কি ক'রে?

অবশেষে ভাষা-সমস্যারও সমাধান হ'ল। কিন্তু শুধু লিখিত অনুবাদের সমস্যা ছিল না, মৌখিক আলোচনার সমস্যাও তো কম নয়। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের পুরো ইতিহাস যখন রচিত হবে তখন ফ্রিস্কোর এই তর্জমাকারীদের নিয়ে একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ লিখতেই হবে।

ভাষ্যকারদের মধ্যে ফরাসী বিশেষজ্ঞ আঁদ্রে কামিঁকার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কূটনৈতিক অনুবাদক হওয়া খুব সোজা কাজ নয়। এজন্য উভয় দেশের চলতি ভাষা সম্বন্ধে কাজ-চালানো গোছের জ্ঞান থাকলেই হয় না, আন্তর্জাতিক আইনকানুন এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান থাকা চাই। এছাড়া চাই ধারালো স্মরণশক্তি। লিখিত প্রবন্ধকে মূল বক্তার মত নাটকীয় দৃঢ়তা এবং বাগ্মিতার সহিত অন্যভাষায় ফুটিয়ে তোলার কাজ এই রকম অনুবাদকের।

এই সমস্ত গুণ ছিল কামিঁকারের। নিজে তিনি আন্তর্জাতিক আইনে সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ, প্রাঞ্জল ভাবে তিনি ইংরাজী এবং ফরাসী দুই ভাষাই বলতে পারেন, তা ছাড়া অনুকরণ বিদ্যায়ও তাঁর ক্ষমতা যথেষ্ট।

উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ণ অধিবেশনের চূড়ান্ত বৈঠকে জনৈক প্রতিনিধি (রামস্বামী মুদেলিয়ার—সম্পাদক) ইংরাজী ভাষায় এক উত্তেজনা এবং উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করেন। তিনি ঘন ঘন হাত নাড়ছিলেন এবং নাটকীয় ভাবে টেব্‌ল্ চাপড়াচ্ছিলেন। একবার তিনি তাঁর হর্ণের হাতলের চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে নেন, টেবলের উপর তা রাখেন, তারপর তাঁর বক্তব্যটা সুস্পষ্ট ক'রে বলে আবার বিশেষ ভঙ্গি ক'রে চশমা জোড়া নাকে তোলেন।

কামিঁকার নিঃশব্দে সমস্ত ঘটনাটা লক্ষ্য করলেন—প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে চলেছিল বক্তার এই বক্তৃতা। এইবার কামিঁকার গিয়ে দাঁড়ালেন বক্তার টেব্‌লে। নির্দোষ ফরাসীভাষায়

সমস্ত বক্তৃতাটার অনুবাদ করা শুরু করলেন, তিনি। মূল বক্তার প্রত্যেকটি ভঙ্গি তিনি নকল করলেন, তেমনি টেবিল চাপ্‌ড়ে গেলেন, ঠিক যেমন ক'রে মূল বক্তা তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে চশমাজোড়া খুলে রেখেছিলেন কার্মিকারও ঠিক তেম্‌নি ক'রে বক্তৃতার মাঝখানে খুলে রাখলেন তাঁর চশমাজোড়া। কার্মিকার-এর সফলতা সভাগৃহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

আর একজন বড় ভাষ্যকার ছিলেন ফরাসী বিশেষজ্ঞ জর্জ ম্যাথু। ১৯২২ সালে বিশ্ব জাতি সংঘে অস্ত্রত্যাগ সম্মেলনের সময় তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কদাচিৎ 'নোট' নেন এবং মূল বক্তৃতার যথাযথভাবে পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁর বিবরণে লিপিবদ্ধ করা আছে যে, সার জন সাইমন্ ম্যাথুকে পরীক্ষা করবার জন্য অস্ত্রত্যাগ সম্মেলনে একটি জটিল বক্তৃতা দেন। সেই এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার মধ্যে অসংখ্য পারিভাষিক কথা ছিল। তাছাড়া স্যর জন সাইমন্ ইংরাজ কবি শেলীর কবিতা থেকে একটা বড় রকমের উদ্ধৃতি করেন।

মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না ক'রে ম্যাথু এই বক্তৃতা ফরাসী ভাষায় বলতে শুরু করেন। মূল বক্তৃতার সংগে আশ্চর্যজনক ভাবে খাপ খেয়ে যায় তাঁর অনুবাদ। তারপর চোখের পলক না ফেলে শেলীর উদ্ধৃতিটিও সঠিক ভাবে তিনি ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। চমৎকার ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই ঘটনাটি।

কিন্তু পেশাদার ভাষ্যকার এবং অনুবাদকারীরাই কেবল সম্মেলনের কঠিন কাজটুকু সম্পাদন করেন নি। প্রায় প্রত্যেক প্রতিনিধিই, বিশ্ব এবং জনগণের নিকট তাঁদের দায়িত্বের কথা স্বীকার ক'রে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত কঠোর পরিশ্রম করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিমণ্ডলীর সম্পাদক বোহুস্ বেনেস বলেন, "এবার বিফলতার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। কারণ, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ দেশে ফিরতে হবে—গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের জনগণের সম্মুখে। প্রাক্তন জাতি সংঘের প্রতিনিধিরা কেবল তাঁদের গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করতেন, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত গভর্ণমেণ্ট ছিল পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু ও অপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট। এবার আমাদের জবাবদিহি করতে হবে বিশ্বের জাগরিত জনগণের কাছে।"

একথা বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রতিনিধিরা এ দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হননি, তাই প্রকৃত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করেন না। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর সকল প্রতিনিধির সম্বন্ধে সত্যকারের এ অভিযোগ না করা গেলেও, অনেকের সম্বন্ধেই কিন্তু অভিযোগটা খাটে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের সঙ্গে এর একটা চমৎকার মিল আছে। ১৭৮৭ সালে আমেরিকায় ১৩টি আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন ছিল এবং এই স্বাধীনতা ত্যাগ করতে রাজি ছিল না মোটেই। আমেরিকা তখন একটা অনির্দিষ্ট অকার্যকরী তথাকথিত "সম্মিলিত রাষ্ট্রের কানুনের" সাহায্যে পরিচালিত হ'ত।

১৭৮৭ সালের মে মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিনিধি প্রেরিত হ'ল। পুরনো 'রাষ্ট্র সম্মেলন কানুনের' কতকগুলো সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছিল, সেই সব সংশোধন সাধন করার জন্য এই প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। কিন্তু সংশোধনের পরিবর্তে এই পঞ্চান্ন জন প্রতিনিধি সভাগৃহে বসে এই ১৩টি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন এক শাসনতন্ত্র

রচনা করলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে গররাজি হ'ল; কারণ, সেই নব্য-শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এক কর্তৃরাষ্ট্রের নিকটে বিসর্জন দিতে হবে তাঁদের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার।

যাই হোক, শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীরা এই শাসনতন্ত্রটিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রসরকারের হাতে দিলেন না, তা পৌঁছে দিলেন একেবারে মার্কিন জনগণের কাছে। সেই মার্কিন জনসাধারণ সেই গঠনতন্ত্রের খসড়াই গ্রহণ করলেন—বিভিন্ন জন-সম্মেলনে বা কন্‌ভেন্‌শনে সমবেত হ'য়ে।

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শাসনতন্ত্রটির বল ততটা যতটা বল দিয়ে মার্কিন জনসাধারণ তার সমর্থন করে—তা ছাড়া গঠনতন্ত্রের অন্য বল নেই। প্রায় ৮০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে একটা গৃহযুদ্ধ বেধেছিল। তার কারণ, কয়েকটি রাষ্ট্রের জনসাধারণ আর বেশিদিন এই শাসনতন্ত্র সমর্থন করতে চায় নি। যুদ্ধে তারা হ'ল পরাজিত, এবং সেই থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র জগতের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্বজাতীয় দলিল হিসাবে টিকে আছে।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতেও আমরা ৫০টি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন জাতির প্রতিনিধিদের দেখেছিলাম। প্রত্যেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতি-সচেতন এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অধিকার তাঁরা বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে বিকিয়ে দিতে একেবারেই রাজি নন। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিনিধিরা যেমন প্রত্যক্ষভাবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতেন না, অথচ তাঁদের নামেই কাজ করেছিলেন, এবং পরে যেমন জনগণ তাঁদের প্রণীত খসড়াকে স্বীকার ক'রে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন,—ঠিক তেমনি বিশ্বের জনগণের উপরই এখন ভার পড়েছে সম্মিলিত রাষ্ট্র-গঠনোপযোগী বিশ্ব সংঘের গঠনতন্ত্রের খসড়া স্বীকার করার ও সমর্থন করার।

বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'চ্ছে সাধারণ পরিষদ। এই পরিষদে সকল ছোট বড় জাতিরই একটি ক'রে ভোট আছে। স্থির হয়েছে, এই পরিষদে স্বাধীন বক্তৃতার উপর কোন বিধিনিষেধ থাকবে না এবং প্রত্যেক প্রতিনিধিই তাঁর নিজের এবং যে কোন দেশের লোকের সমস্যা আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে পারবেন। বৎসরে একবার পরিষদের সভা হবে। সেই সভার বিবরণ সারা বিশ্বের চোখের সামনে ধরা হবে। বিশ্বের সাংবাদিক এবং বেতার বক্তারা তাতে উপস্থিত থাকবেন, প্রতিদিনকার ঘটনাবলী তাঁরা সারা বিশ্বের জনগণের নিকটে প্রচার করতে পারবেন।

তা হ'লে আমাদের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তাকে সদ্ব্যবহার করার প্রচণ্ড দায়িত্ব এবং সুযোগ এসে পড়ছে আমাদের উপর। মার্কিন শাসনতন্ত্রের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ভূমিকাংশ যেমন শুরু হয়েছে "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ" কথা দিয়ে—সম্মিলিত জাতিদের এই গঠনতন্ত্রও তেমনি শুরু হয়েছে "আমরা সম্মিলিত জাতির জনগণ" কথাটি দিয়ে।

সম্মিলিত-জাতি সনদে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেল, বিশ্বের জনগণ এর আগে কখনও এমন সুযোগ সুবিধা পায়নি। সমস্ত মানুষের সমস্যা অন্তত বিশ্ব জনমতের আসরে তুলে ধরা যাবে। পৃথিবীর জাতিদের পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বর্তমানে এখন পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে। তাতে ভারতীয় জনগণের সমস্যার মত সমস্ত মানুষের সমস্যাই শোনবার মত সাধারণ দরবারই শুধু আজ পাওয়া যাবে না, উৎসুক এবং উৎসাহী বন্ধুদের আসরও পাওয়া যাবে এখন থেকে।

কাজেই বিশ্বসনদ থেকে আমরা কতটুকু ভরসা পেতে পারি, কথাটা তা নয়; কথাটা বরং এই—আমাদের উপর কতটুকু ভরসা করতে পারে—বিশ্ব সনদ। আমরা যতটা জোর দিয়ে এই সনদকে সমর্থন করব, এই সনদের জোর ঠিক ততটুকুই হবে, তার বেশি নয়।

ভারতের সমস্যা যদি বিশ্বের জনগণের স্বার্থে ও সহযোগিতার অপেক্ষায় তাদের সামনে তুলে ধরতে হয় তা হ'লে এই নবজাতক বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হবে, এই কথা বলাই যথেষ্ট।

উইলিয়ম উইণ্টার

# পুস্তক-পরিচয়

**মহাস্থবির জাতক**—"মহাস্থবির"। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই সাহিত্যরসিক পাঠকবর্গের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। ছদ্ম নামের অন্তরালের মানুষটির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁদের কাছে আত্মকাহিনীর অনেক অংশ সুবিদিত। তাঁদের কাছেই শুনেছিলাম যে গ্রন্থকারের গল্প বলবার ক্ষমতা নাকি অসাধারণ। বর্ত্তমান রচনা তাই প্রমাণ করে; উপরন্তু ভাষার উৎকর্ষে রচনাটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

গ্রন্থকারের শৈশব ও কৈশোর জীবন ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ছিল না। শহরের ঘনবদ্ধ ইমারতের মধ্যে দুর্নীতিকাতর গুরুজনদের শাসনাধীনে প্রতিপালিত বালকের অভিজ্ঞতা নিরানন্দময়, কিন্তু শক্তিশালী শিল্পীর তুলিতে অতিবড় দুঃখের চিত্রও কতখানি মনোজ্ঞ হয়ে প্রকাশ হতে পারে তার পরিচয় দেবার পূর্ব্বে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে চাই।

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা ও সে-সময়ের প্রগতিকামী ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ সমাজ-বিবর্ত্তনের তথ্য হিসাবে মূল্যবান হতে পারতো কিন্তু গ্রন্থকার তাঁর স্মৃতিলোক হতে যে কয়েকটি রেখা টেনে এনেছেন সেগুলি মুখ্যত ব্যঙ্গবাচক। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা, আদর্শবাদ, ধর্ম্মনিষ্ঠা সব কিছুই অন্যায় ও হাস্যাস্পদ এমনি একটি ধারণা গ্রন্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রচারিত হয়েছে। শিশুচিত্ত মারফৎ এ প্রচার আমি অন্যায় বলে মনে করি।

বলা বাহুল্য গ্রন্থকার যাবতীয় মনুষ্য-বিরচিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে বীতশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তার সঙ্গে শিশু ও বালক "স্থবির" এক মত হতে পারে না কারণ এ ধারণার মূলে রয়েছে আজীবনসঞ্চিত নৈরাশ্য।

এই নৈরাশ্যবোধ দুঃসহভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে পাগলা সন্ন্যাসীর চরিত্রে। বীতশ্রদ্ধার মধ্যে ঘৃণার লেশ নাই কারণ যে পিতাকে উদ্দেশ্য করে গ্রন্থকার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন উৎসর্গপত্রে, তিনিই রয়েছেন বিদ্রূপ-চিত্রের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে।

আশাকরি জাতকের পরের খণ্ডে জীবনের প্রতি এই অস্বাভাবিক অনীহার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাততঃ এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে গ্রন্থকার পাঠকের মনরঞ্জনে সিদ্ধহস্ত এবং অক্লেশে এমন একটি কৌতূকাবহের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করেছেন নিজের বক্তব্যকে যে গ্রন্থ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আবিষ্ট হয়ে থাকতে হয় এবং দার্শনিক অন্তর্ধারার প্রতিক্রিয়া বর্ত্তায় অনেক পরে।

গ্রন্থকারের পিতা 'মহাদেব' ছিলেন শিশুর মত খেয়ালী, প্রতিক্রিয়া-প্রবণ ও সমারোহ প্রিয়। ভদ্রলোক উচ্চ আদর্শ ও প্রবল ধর্ম্মনিষ্ঠায় পরিচালিত হয়ে একটির পর একটি করে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে যারপরনাই বিড়ম্বিত হচ্ছেন। তাঁর অভ্রভেদী

চরিত্রবল প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে অদৃষ্ট বিপাকে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গ বিব্রত হচ্ছে, উনি কখন কি করে বসেন—মোট কথা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে কৌতুক সৃষ্টির অতিরিক্ত কোন কাজ করে যেতে পারেন নি তিনি।

বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক পাগলা সন্ন্যাসী সোজাসুজিই গেয়ে গেছেন জীবনের ব্যর্থতা।

স্থবির ছিল সুদর্শন ও প্রত্যুৎপন্নমতি বালক, সুতরাং ঘনবদ্ধ ইষ্টকপ্রাচীর ও উদ্যত শাসনের মধ্যে আটক অবস্থাতেও একাধিক নারীর সংস্পর্শে এসে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে বিচিত্র এমন কি সমালোচক-চিত্তে মাঝে মাঝে ঈর্ষারও উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন সম্বন্ধই স্থায়ী হতে পারে নি। কৈশোরের যৌন-চেতনা তৃপ্তিদায়ক হয় না সত্য কিন্তু স্বল্প-পরিসর জীবনে এতগুলি অবসাদপূর্ণ অভিজ্ঞতা একসঙ্গে পুঞ্জীকৃত হওয়াও অস্বাভাবিক।

বহুদিন পূর্ব্বে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর একখানি উপন্যাস সমালোচনা করেছিলাম যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'হৃদয়ের মৃত্যু।' তিনি দেখিয়েছিলেন কেমন ক'রে কৈশোরের কোমল অনভিজ্ঞ হৃদয় রূঢ় অভিজ্ঞতার সংঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শৈশবে অনুভূত মাতৃস্নেহের প্রস্রবণও ক্রমশঃ সংসারের অশান্তি ও কোলাহলের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়।

বালকের এ দুর্ভাগ্যের কথাও আমি প্রতিকূল সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করলাম কারণ গ্রন্থখানিকে আমি ঘটনার পারম্পর্য্যে নিয়ন্ত্রিত আলোক-চিত্র জাতীয় আত্মচরিত বলে মনে করি না। এর চয়নে গ্রন্থকারের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে রসসৃষ্টির তাগিদ। সেই তাগিদে তিনি অনায়াসে স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে গেছেন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতীতের এমন এক একটি দিনে যার আলো-ছায়া, আকাশ বাতাস, স্বাদ গন্ধ, কথাবার্ত্তা, আনন্দ দুঃখ সবই স্পষ্ট ও বিশদ-ভাবে পরিস্ফুট। বলা বাহুল্য গ্রন্থকারের এ নব-উজ্জীবিত স্মৃতিসম্ভার বালক-হৃদয়ের অবদান নয়—এ হচ্ছে নিছক সাহিত্যসৃষ্টি।

উপরিউক্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জনা যে আলেখ্যর কৌতুকাবহ ব্যাহত করে নি, সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত অপর্যাপ্ত কৌতুক সে ভাবধারাকে প্রকট হয়ে উঠতে অবসর দেয় না। তখনকার গড়ের মাঠের সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, এগারোই মাঘের উৎসব, মেয়ে ইস্কুল, ছাত্রপীড়ন, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি বহু বিচিত্র উত্তেজনার মধ্যে মহাদেবের অঘটন ঘটানোর কৃতিত্ব পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করে রাখে!

মহাদেবের তিন পুত্র। স্থবিরের বয়স যখন ছয় তখন তার ছোট ভাই অস্থিরের বয়স চার আর বড় ভাই স্থিরের বয়স ন বছর। ছোট দুই ভাই-এর মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ। অগ্রজ স্থির ছেলেদের ইস্কুলে পড়ে আর তাক লাগিয়ে দেয় নিত্য নূতন রোমহর্ষক আস্ফালনে। স্থবির আর অস্থির দূর হতে সমীহ করে তাকে। তাদের কোন ভগ্নী নাই, বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গ তারা পায় না; তার ওপর পিতার কড়া

হুকুম দোতলা থেকে একতলায় নামতে পারবে না। অগত্যা বারান্দার এক কোনা হতেই দু'ভাই-র আঁখি-পাখি পক্ষ-বিস্তার করতো কল্পলোকে।

অভিজ্ঞতার এক নূতন দ্বার খুলে গেলো স্থবির যখন মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি হলো। সেই থেকে একটানা নিগৃহীত শিক্ষা-জীবনের মাঝে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করেছে সে। ছয় বছর বয়সে বাংলাদেশের পল্লী-গ্রামের সঙ্গে স্বল্পকালের আনন্দময় পরিচয় ব্যতীত স্থবিরের বাল্যকাল কেটেছে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে। মিথ্যা অভিযোগে প্রথম শাস্তি ভোগ; মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। দুঃস্থব্যক্তির বৃদ্ধ হওয়ার অপরাধে চাকরি যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা; কুমারী মাতার দুর্দ্দশা দর্শন; প্রথম বাজারের পয়সা হতে চুরী; প্রথম যৌনবোধ; উন্মাদিনীর চোখের জল দর্শন; প্রথম কাব্য পরিচয় ও প্রথম সুরাপান; মিথ্যা কথনে উপকারিতার প্রথম আবিষ্কার—প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে এবং কী সুন্দর তার বর্ণনা। কোথাও অতিশয়োক্তি বা চাঞ্চল্যের লেশ নাই। অদ্ভুত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী আর ভাষার নির্ভার মাধুর্য্য পাঠককে মুগ্ধ করে।

মহাদেব ছিলেন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ। আবক্ষ কালো দাড়ি। চোখের ভুরু হতে মাথার উপর পর্য্যন্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন। সেই স্থানে আততায়ীদের রামদা বহন করেই তিনি উদ্ধার করতে ছুটেছিলেন হিন্দু ঘরের এক বিধবা মেয়েকে। এই অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ব্যক্তিটি একবার সারাদিন একটি চিলকে সারা শহর তাড়া করে বেড়িয়ে একখণ্ড মাছ উদ্ধার করে আনেন। এই অদ্ভুত একাগ্রচিত্ততা কেমন করে বর্ত্তালো পুত্রত্রয়ের নৈতিক উন্নয়নে তাই হচ্ছে গ্রন্থের ট্রাজেডী।

জ্যেষ্ঠপুত্রের পরিণাম কি হলো সে কথা গ্রন্থবদ্ধ হয় নি। অস্থিরের অকালমৃত্যু ঘটে আর স্থবির একাধিকবার অকৃতকার্য্যের পর পনের বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

মহাদেব-পরিবারের এ ট্রাজেডী ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত না হলেও তখনকার সমাজে মহাদেবের মত ট্র্যাজিক চরিত্রের অভাব ছিল না। অশৌচ বন্যার মুখে খড় কুটার মতই ভাসতে ভাসতে বহু মহানুভব ব্যক্তি অসীম ক্লেশে আপন আপন শুচিতাকে শূন্যমার্গে উড্ডীন রেখে উপহাসাস্পদ হয়ে গেছেন। বর্ত্তমান যুগের পরি-প্রেক্ষণায় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে কিন্তু তাঁদের কালেই শ্যাম মাষ্টারের মত অসহিষ্ণু হিংস্রক সংস্কারক সে-সময়ের শিক্ষা দীক্ষা সব কিছুকেই উপহাস্য করে গেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সকলেই স্থান পেয়েছেন বর্ণনার সৌন্দর্য্যে পল্লবিত হয়ে। পাগলা সন্ন্যাসী ব্যতীত কোন চরিত্রই দুঃসহভাবে প্রকট নয়। বিবরণ বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে খণ্ড খণ্ড চিত্রে। স্থানাভাবের জন্য তিনটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করবো :

কীর্ত্তনিয়াব দল ততক্ষণে শ্রান্ত হয়ে যে যার একটু জায়গা যোগাড় ক'বে ব্যাপাবে সর্বাঙ্গ ঢেকে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছেন। একটু আগেই এই লোকগুলিই যে বিবিধ ভঙ্গিতে বদন ব্যাদান

ও অস্বাভাবিক হস্তপদ চালনা ক'রে বিষব্যালীর দংশনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছিল, এখন তাদের শান্ত মুখমণ্ডল ও সমাহিত অবস্থা দেখে তা বোঝবার জো নেই। মন্দিরগৃহ লোকপূর্ণ। গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানালা দরজা দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসায় ফুলসজ্জায় সজ্জিত মন্দিরগৃহের দেওয়াল, থাম ও বেদী অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কীর্ত্তনীয়াদের কণ্ঠ নিঃসৃত সেই গগনভেদী আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হওয়ায় সেখানে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করছে। সকলেই উন্মুখ আগ্রহে যেন কিসের প্রতিক্ষায় রয়েছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের বুকে হঠাৎ ভৈরবীর সুর ধারা নেমে এল করুণার প্রস্রবনের মত—

হেরি তব বিমল মুখ ভাতি,
দূর হল গহন দুখ-রাতি।

স্থবির দেখতে পেলে, তাদের একটু দূরে একজন কালো প্রিয়দর্শন যুবক কোকিল কণ্ঠে গান শুরু করেছে। গানের বাচ্যার্থ অথবা ভাবার্থ বোঝবার মত বয়স বা শিক্ষা তা'র তখনও হয় নি, তবুও তার মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ বিষব্যালীর ওপর এ যেন বিশল্যকরণীর প্রলেপ, কোথা থেকে—কোন অদৃশ্যলোক থেকে আসছে যেন আশার বাণী, কি আনন্দের উৎস রয়েছে ভৈরবের ঐ ভৃঙ্গারে—রাত্রি চারটের সময় উঠে সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান, সকালবেলাকার অমন আড্ডার বদলে বয়স্কদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে তন্মনস্ক হয়ে ব'সে ঈশ্বরারাধনার কৃচ্ছ্রসাধন বালকের মনে যে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিল, নিমেষে তা অপসারিত হয়ে গেল।

* * * *

"মাঠের মধ্যে তখনও ঘন কুয়াশা। দূরে গাছপালা, লাটের বাড়ি কিংবা জাহাজের মাস্তল কিছুই দেখা যায় না। পূবদিকে সূর্য্য উঠেছে, কিন্তু তার যেন কোন তেজই নেই। সূর্য্যকিরণ সেই ঘন কুয়াশার ওপর পড়েছে বটে, কিন্তু তা ভেদ করতে পারছে না; জলের ওপরে তেলের ফোঁটাগুলো যেমন ক'রে ভাসতে থাকে, তেমনি ধোঁয়াটে কুয়াশার মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খানিকটা ক'রে আলো ভাসছে মাত্র।"

* * * *

"স্তব্ধ বনস্থলীতে হঠাৎ ঝড় উঠলে প্রথমে যেমন দূর—বহু দূরাগত জয়ধ্বনির মত শব্দ হতে থাকে, তারপরে সেই অখণ্ড আওয়াজ বাড়তে বাড়তে সমস্ত অরণ্যব্যাপী উল্লাস জাগে, এসেছে, এসেছে, ওরে এসেছে রে! বিশাল বনস্পতি থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যে জননী ধরণী নিয়ত স্তন্যদানে তাদের পোষণ করছে তার বুক ছিঁড়ে এই নব চেতনার উন্মাদনায় ভেসে যেতে চায়, কামদেবের ফুলধনুর স্পর্শমাত্র সেই কৈশোরেই আমার মনের অবস্থা সেই রকম হয়ে পড়ল। মনের সমস্ত বৃত্তি, জীবনের সমস্ত কামনা লতুকে ঘিরে—সে যেন আমার চোখের সেই অঞ্জন, যা লাগলে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর ঠেকে। ধরণী আমার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠল।"

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

**রসসাহিত্য**—নবেন্দু বসু ( শতাব্দী গ্রন্থমালা, দু'টাকা )

পঞ্চান্ন পাতার ছোট বই; পাঁচটি প্রবন্ধে লেখক রসসাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন; আলোচনাগুলি মোটের ওপর প্রাথমিক, কিন্তু সুখপাঠ্য

এবং সহজ একটি বিচারবুদ্ধির স্বচ্ছতা পাঠককে আনন্দদান করে। সাহিত্যে রসবিচারের তত্ত্ব আর রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকশ্রেণীর জন্যে লেখা বই বাংলায় একরকম নেই বললেই চলে; সেদিক দিয়ে এই বইখানার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নানা সাহিত্যজ্ঞানীর নানা আলংকারিক মতবাদের আর তর্কের জটিলতা বাদ দিয়ে, লেখক সরল ও পরিচ্ছন্নভাবে রসতত্ত্ব বিচারের মূল সূত্রগুলির একটি পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথম প্রবন্ধে সাধারণভাবে সাহিত্য থেকে প্রভেদ দেখিয়ে রসসাহিত্যের গোষ্ঠী-নির্ণয় ক'রে নেওয়া হয়েছে: সামাজিক উৎপত্তিগত কারণ ছাড়াও নিজস্ব সাহিত্যিক-গুণেই যে-সাহিত্য পাঠকের ভাবজগতে আবেদন জানায়, তাকেই বলি রসসাহিত্য; আর গবেষণা ও মানসিক অনুশীলনের বিবৃতি, যা কেবল বুদ্ধিগত, তাই তথ্য-সাহিত্য; কিন্তু কোনটাই স্বয়ম্ভু 'নিছক সাহিত্য' নয়। তথ্যসাহিত্য যেমন রস-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে কুশলী সাহিত্যশিল্পীর স্বকীয় রচনার প্রসাদ-গুণে, তেমনি রসসাহিত্য-সৃষ্টির ও তার রসোপভোগের মূলেও আছে বিভিন্ন সামাজিক বৃত্তি, অবস্থা-পারম্পর্যের সংঘাত ও সংগতি, সমকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিবেশ, যুগধর্ম প্রভৃতি।—এই উক্তির প্রথমাংশের স্বপক্ষে নজীর দেওয়া হয়েছে 'গদ্যে রসরচনা' শীর্ষক চতুর্থ প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী থেকে বিশদ উদ্ধৃতি দিয়ে; আর দ্বিতীয়াংশের স্বপক্ষে উদাহরণ ধরা হয়েছে প্রাচীন লেখিকা রাসসুন্দরী দেবীর পঁচাত্তর বছর আগে প্রকাশিত আত্মজীবনী। এই তৃতীয় প্রবন্ধটিতে রচনার 'ভঙ্গী ও রীতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন যে শুধু শিল্পের চরিত্রগুণই নয়, শিল্প-রচনার সমগ্র আঙ্গিকও নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্পীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা; ও যে আবেষ্টনীর মধ্যে শিল্পীর জীবনের ভূমিকা রচিত হয়েছে সেই আবেষ্টনী থেকেই বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বই নির্দিষ্ট করে শিল্পীর কলাকৌশল আর রচনাপদ্ধতি। তাই, উনিশ শতকের ধনী গৃহস্থবধূ রাসসুন্দরীর আধাসামন্ততন্ত্রী অন্তঃপুরবাসী মনের মেয়েলী নির্ভর-প্রবণতা আর ইংরেজী আমলের নারীশিক্ষা আন্দোলন-ছোঁয়া ব্যক্তিত্বসচেতনতা তাঁর ভাষায় এনে দিয়েছে ঈষৎ সংকোচে, চাপা স্বরে অথচ অমায়িকভাবে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বলা একটি ঘরোয়া আলাপের সুর।

'গদ্যে রসরচনা' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বক্তব্যকে বিশদ করবার জন্যে লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধগুলি আলোচনা করেছেন; কিন্তু এই আলোচনা এতই বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ যে এটি তথ্যসাহিত্য ও রসসাহিত্যের আপেক্ষিকতা ও একাত্মতা বিষয়ক প্রবন্ধ না হ'য়ে, বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবুকতা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি অতি স্নিগ্ধ ও সরস, এবং দুঃখের বিষয় দেশের পাঠক সাধারণের কাছে বলেন্দ্রনাথ আজও স্বল্প-পরিচিত, সেজন্যে বলেন্দ্র-সাহিত্যের বহুল আলোচনা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যে

রসের বিকাশের পরিচয় দিতে গিয়ে কেবল রবীন্দ্রনাথেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে ভারসাম্যের অভাব ঘটানো খুব যুক্তিযুক্ত হয়নি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে কাব্যানুবাদকে উপলক্ষ ক'রে রসের ক্রিয়া-প্রকৃতির অনুসরণ করা হয়েছে। কাব্য-অনুবাদের বেলায় কেবল ভাষান্তরিত করবার নিয়মগুলি মানলেই চলে না, কারণ কাব্য তত্ত্ব ও তথ্যসর্বস্ব নয়; কাব্যের প্রাণবস্তু হচ্ছে রস, যা' ভাষাতিরিক্ত; সুতরাং রস যতটুকু এবং যে পরিমাণে ভাষানির্ভর, অনুবাদ-কাব্যরসও ততটুকু এবং সেই পরিমাণে স্ফূর্তি পায়।—এক্ষেত্রেও সেই রসস্রষ্টা ও রসিকের স্থানিক আবেষ্টন ও অনুষঙ্গের সম্বন্ধ-বন্ধন পরবর্তী প্রবন্ধের ( 'ভঙ্গী ও রীতি' ) উপপাদ্যের দিকেই নির্দেশ দেয়। পঞ্চম প্রবন্ধ 'সৃষ্টি ও সমালোচনা'; এই শেষ প্রবন্ধটি রস-সাহিত্য-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম সম্বন্ধে সহজ ও সরল দিক্‌নির্ণয়।

রসসাহিত্য সম্বন্ধে এই ধরনের সংযত ও পরিমিত একটি আলোচনার বই যে আমাদের মত সাধারণ পাঠকশ্রেণীর পক্ষে খুব উপকারী হয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি, কিন্তু পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার বই-এর দু'টাকা দাম বোধ হয় বইখানার বহুল প্রচারের পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা।

রবীন্দ্র মজুমদার

## WILD RIVER—ANNA LOUISE STRONG.

চীন ও রুশের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ বা পুস্তক-রচয়িত্রী হিসাবেই ডাঃ আনা লুই ষ্ট্রং আমাদের কাছে সুপরিচিত। সেই সব চমকপ্রদ ঘটনা-প্রবাহ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে রসসাহিত্য রচনাতেও যে তিনি সিদ্ধহস্ত—আলোচ্য উপন্যাসেই তার যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে। কাজটা অবশ্য সহজ নয়। প্রথমত সমসাময়িক ঘটনার আবর্তে আলোড়িত হ'তে হ'তেই তার যথাযথ ঐতিহাসিক মূল্যবিচার অত্যন্ত কঠিন—বিশেষ ক'রে বিদেশীর পক্ষে। দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণই এখানে বড় কথা নয়। ইতিহাসের উপাদান—সমসাময়িক ঘটনাবলীর সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এখানে মুখ্য। তাই ডাঃ ষ্ট্রং-এর নবার্জিত সাফল্য তাঁর গুণগ্রাহীদের কাছে সানন্দ বিস্ময়ের খোরাক যোগাবে।

এ উপন্যাসের পৃষ্ঠপট অবশ্য বিরাট। রুশদের উপর দিয়ে বিপ্লববন্যা সদ্য ব'য়ে গেছে। ভাঙনের দিকই তাই তখন প্রবল। পথে পথে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে বিপর্যস্ত মানুষের দল। প্রতিকূল অবস্থার পেষণে, জীবন-সংগ্রামের অবিশ্রাম তীক্ষ্ণ আঘাতে তারা ভুলেছে সমাজজীবনের সমস্ত মূল্যবোধ—একটা অন্ধ, অবিবেকী সমাজবিরোধী হিংস্রতায় তাদের মন আচ্ছন্ন। এই রকম একটি কিশোরের দল আস্তানা গাড়ল নীপার নদীর তীরে—এক গুপ্ত গুহায়। সেইখান থেকে চুরী ডাকাতি করে তারা সংস্থান করে জীবিকার আর তারই মধ্যে আয়ত্ত করে একটা হিংস্র কর্মনৈপুণ্য। অশান্ত নীপারের একান্ত

আপনার জন এই কিশোর দস্যুর দল। এদের নেতা স্টেফানই হ'ল উপন্যাসের নায়ক।

ইতিমধ্যে কিন্তু কিছু কিছু সৃষ্টিও শুরু হয়েছে দেশে, কারণ ভাঙাগড়া নিয়েই বিপ্লবের সমগ্রতা। ভাঙনের তাণ্ডবের পর দেশের মন স্বতঃই ঝুঁকল একটা ভার-সাম্যের দিকে। স্টেফানের দলও বুঝল যে পুরোনো চালের জীবনযাত্রা এবার অচল হবার সময় এল। তাই গুপ্ত গুহা ছেড়ে তারা যোগ দিল কাছাকাছি এক যৌথকৃষিকেন্দ্রে। কিন্তু অশান্ত নীপারের সন্তান এই অশান্ত কিশোর দলের কারো কারো কাছে এই নূতন জীবনযাত্রা বড় বেশী নিরুদ্বেগ, উত্তেজনাহীন ঠেকল। তার উপরে ছিল পুরাতন, বল্‌গাহীন জীবনের সমাজবিরোধী অভ্যাসের জের। তাই যৌথকৃষিকেন্দ্র শীঘ্রই স্টেফান-অনুচরদের অবিশ্রাম অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতায় বিপর্যস্ত হ'ল। এমন কি কেন্দ্রের কিছু কিছু রসদও এদের হাতে চালান হ'ল গুপ্ত গুহায়।

সৌভাগ্যের কথা বিপ্লবের কর্ণধার যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিছক স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। মানুষ চিনবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল অসামান্য! স্বপ্ন তাঁরা দেখতে জানতেন কিন্তু তাঁদের ছিল সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার দুর্লভ শক্তি। স্টেফান ও তার জনকয়েক অনুচর যৌথকৃষিকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি চুরীর দায়ে অভিযুক্ত হ'য়ে এমনই এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি নেতার সামনে এসে হাজির হ'ল। এই নিকোলাই ইভানোভিচ আমাদের লালফিতে ও ইস্পাত ফ্রেমে আবদ্ধ নির্বোধ আমলাদের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখলেন না। তিনি দেখলেন গ্রামাঞ্চলে কুলাক্‌ বা বিত্তশালী কৃষকের সোভিয়েটবিরুদ্ধতা ক্রমশই বেপরোয়া হ'য়ে উঠছে। আর এদেব চক্রান্তে পড়েছে বিপ্লবের নাড়া খাওয়া, অস্থিরচিত্ত কিশোর স্টেফান ও তার অনুচরবৃন্দ। চারিদিকে নূতন সৃষ্টির যে সমারোহ চলেছে তার সঙ্গে এরা ঠিক সুর মেলাতে পারছে না—এমন কি সমাজবিরোধী কাজে সোভিয়েটের জাতশত্রুদের কবলেও খানিকটা গিয়ে পড়েছে। তবু তিনি এই কিশোরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন জ্বলন্ত হৃদয়াবেগ, নেতার উপযোগী দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বিপুল প্রাণপ্রাচুর্য আর অশান্ত নীপারের প্রতি গভীর মমতা। তাই সরাসরি সাইবেরিয়া চালানের ব্যবস্থা না দিয়ে তিনি স্টেফানকে দুর্বার নীপার স্রোত বাঁধবার যে বিপুল প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল তারই এক মজুর হিসাবে বাধ্যতা-মূলক পরিশ্রম করবার সুযোগ দিলেন। নূতন স্টেফানের জন্ম হ'ল এইখানেই।

এখানেও একটানা, খাড়া উঁচুর দিকে অগ্রগতি হ'ল না। এমন কি নিজের ছোট দলকে 'সোশ্যালিষ্ট' প্রতিযোগিতায় জেতাবার প্রচণ্ড আগ্রহে স্টেফান একবার পাশের দলের যন্ত্র সরিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্য। কিন্তু ধরা প'ড়ে এখানে তার হ'ল নূতনতর শিক্ষা ও সমাজবোধ। যুক্তিটা দেওয়া হ'ল অত্যন্ত সহজ ও অকাট্য। সেটি হ'ল—তোমার নিজের ছোট দলকে প্রতিযোগিতায় জেতাবার জন্য প্রাণপাত করতে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু নীপারের একপারের এই রকম সমস্ত

ছোট দলগুলির সঙ্গে অন্য পারের দলগুলির প্রতিযোগিতার কথাও মনে রাখতে হবে। তাই নিজের ছোট দলটিকে জেতাতে গিয়ে এমন কোন কৌশল প্রয়োগ করলে চলবে না যা বৃহত্তর দলের জয়কে-ব্যাহত করে। এর পরেও আছে সমস্ত নীপার মজুরদের প্রতিযোগিতা অন্য শিল্প-মজুরদের সঙ্গে—আর তার পরেও সমগ্র সোভিয়েটশিল্পের জোর লড়াই দুনিয়ার শিল্পের সঙ্গে। অর্থাৎ সোশ্যালিষ্ট প্রতিযোগিতার মূল কথাটি ভুললে চলবে না।

এ দিকে সোভিয়েট-শিল্পের পাশাপাশি গ'ড়ে উঠল নূতন যৌথকৃষি। প্রকৃতি ও মানুষের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এই রকম একটি কেন্দ্র, "Red Dawn Farm"এর আশ্চর্য সংগ্রামের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কুলাক বা বিত্তশালী কৃষকদের বে-পরোয়া বিরুদ্ধতায়, পঙ্গপালের হাত থেকে শস্য বাঁচাবার লড়াই, কৃষকমাত্রেরই উগ্র ব্যক্তিস্বত্ব বোধকে সমাজবোধে রূপান্তর ঘটানো প্রভৃতির কথা এখানে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে সুন্দরভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা অ্যানিয়ার সঙ্গেও সত্যকার পরিচয় হয় এই যৌথকৃষির পৃষ্ঠপটেই। অ্যানিয়া ছিল বীট চাষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। এই উপলক্ষে মস্কৌতে তার সঙ্গে স্বয়ং স্টালিনের সাক্ষাতের বর্ণনাও চমৎকার। নেতৃত্ব সম্পর্কে অ্যানিয়া এইখানেই সোভিয়েটের সব থেকে বড় নেতার কাছে শুনল "Leaders come and go—only the people are immortal."

দুরন্ত নীপার ক্রমে বাঁধা পড়ল সোশ্যালিষ্ট মানুষের হাতে। দেখতে দেখতে গ'ড়ে উঠল দুনিয়ার সব থেকে বড় বাঁধ আর পৃথিবীর বৃহৎ বিজলী-নগরের অন্যতম নাইপেষ্ট্রয় শহর। তার বৈদ্যুতিক প্রাণশক্তি ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য শহরে আর পত্তন হ'ল নূতন নূতন শিল্পের। এমন কি যৌথকৃষিও এর অকৃপণ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত রইল না।

তারপর এল ফ্যাশিস্ট পঙ্গপালের বর্বর অভিযান। মহান নেতার মুখে 'পোড়া-মাটির' দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হ'ল। সোভিয়েট সমাজের অন্তরাত্মা দৃপ্ত হ'ল সর্বস্ব পণের গরিমায়। প্রয়োজন হ'ল শত্রু প্রতিরোধের জন্য নীপারের বন্ধনমুক্তির। যে স্টেফানের নূতন জীবন ছিল এই সৃষ্টির প্রত্যেকটি পাথরের সঙ্গে জড়িত তারই 'পরে ভার পড়ল এটিকে ধ্বংস করার। ঠিক হ'ল যতক্ষণ সম্ভব বাঁধটাকে অক্ষত রেখে উপরের সেতুপথে যাত্রী যাতায়াতের পথ খোলা রাখা হবে। তারপর শত্রু একেবারে কাছে এসে গেলে ধ্বংস করা হবে সেটিকে। পাছে ধ্বংস করার আগেই শত্রুর আচম্‌কা গুলিতে অপমৃত্যু ঘটে তারই জন্য স্টেফান এমন একটি জায়গা বেছে নিল যেখানে গুলীবদ্ধ হ'লেও তার দেহের পতনেই বৈদ্যুতিক ধ্বংসযন্ত্র আপনা থেকেই চালিত হবে আর বাঁধ নিমেষে মিলিয়ে যাবে শূন্যে।

সৌভাগ্যক্রমে প্রয়োজন হ'ল না এই চরম মূল্যদানের। ধ্বংসের কাজ নির্বিঘ্নে সেরে পুরাতন ভবঘুরে-যুগের বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর নিয়ে স্টেফান আবার বিশ বছর প'ড়ে পৌছল তার আবাল্য পরিচিত গিরিগুহায়। প্রথমেই চমকে উঠে দেখল

তার দশ বছরের ছেলে কৌশলে মায়ের স্নেহআবেষ্টন এড়িয়ে আগেভাগেই বসে আছে সেখানে—ফ্যাশিস্ট প্রতিরোধের জন্য। স্টেফান তাকে বকুবার উপক্রম করতেই তার বন্ধু ম্যারিন তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল—"বিশ বছরের আগের স্টেফানের কথা মনে রেখো"। অতএব বিশ বছরের আগেকার গুপ্তগুহা থেকে আরম্ভ হ'ল সেকাল ও একালের স্টেফানদের সমবেত গেরিলা-প্রতিরোধ। এইখানেই উপন্যাস শেষ।

স্টেফান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সোভিয়েট সমাজে তার নবজন্মই হ'ল "Wild River"এর মূল আকর্ষণ। কিন্তু এ ছাড়াও নায়ক চরিত্রের বিকাশ ঘটানর জন্য যে সব চরিত্রের অবতারণা সেগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। যে নিকোলাই ইভানোভিচের সুনিপুণ ও দরদী বিবেচনা নায়কের রূপান্তর ঘটালো—পরিসরে ছোট হ'লেও উপন্যাসের সেটি একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। নায়িকা অ্যানিয়া, কিশোর কমিউনিস্ট মোরোসভ, আইভান্, স্টেসা—সব চরিত্রগুলিই উজ্জ্বল। সব নিয়ে যৌথ কর্মচাঞ্চল্য ও সে পথের নানা বাধা বিঘ্ন সমস্যার যে ছবি এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে তা' শুধু কতকগুলো বিচ্ছিন্ন নক্সা আলগা ক'রে একজোট করার প্রয়াসমাত্র নয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার ফলে তা'তে সমগ্র উপন্যাসের আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে গেছে। সোভিয়েটের যৌথ কৃষির প্রাথমিক স্তরের—বিশেষ ক'রে কুলাক-প্রতিরোধের যুগের সাহিত্যিক প্রকাশ যেমন Sholokov-এর "Virgin Soil Upturned"এ—তেমনিই সোভিয়েট শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি ও 'পোড়ামাটির' যুগের সাহিত্যিক প্রতিফলন হ'ল "Wild River"। এ দুই যুগের পাশাপাশি বিচারের কথা প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের শেষ ক'টি লাইনে। সব কিছু ধ্বংস ক'রে যখন স্টেফানের দল ফের আবার পৌছল সেই পুরাতন গুপ্তগুহায় তখন বন্ধু ম্যারিন বলল—"আমার মনে হ'চ্ছে নীপারের বাঁধ আর Red Dawn Farm ধ্বংসের পর আমরা যেন আবার বিশ বছর আগের যুগে ফিরে গেছি যেখান থেকে একদিন শুরু করা গিয়েছিল।" বাধা দিয়ে স্টেফান বলল—"না। আমরা এগিয়ে গেছি কুড়ি কোটি মানুষের জীবনের প্রসারে। আমরা শুধু Red Dawn Farm ও নীপারের বাঁধই সৃষ্টি করিনি। আমরা গড়েছি এমন মানুষ যারা দুনিয়াকে বাঁচাবার জন্য নিঃশেষে ধ্বংস করতে পেরেছে সেই কৃষি আর সেই বাঁধ।"

চিন্মোহন সেহানবীশ

··· সামান্য এবং বৈষম্য, দুটাকেই হিসাবের মধ্যে আনা চাই। বৈষম্য না থাকিলে জগৎ টিকিতেই পারে না। সব মানুষ সমান বটে, অথচ সব মানুষ আলাদা। তেমনি দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্য-সমাজের সাম্যও আছে, বৈষম্যও আছে। ···

রবীন্দ্রনাথ

# রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

জাতীয়তাবাদের যাঁরা ইতিহাস জানেন তাঁরা জানেন যে, কোনো জাতির উদ্বোধনের পক্ষে একটা বড় শক্তি হয় তার অতীত ইতিহাসের প্রেরণা। আমাদের জাতীয়তাবোধের বেলাও আমাদের অতীত কীর্ত্তিকথা, পুরাবৃত্তের জ্ঞান, ভারত ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার, এরূপ শক্তি সঞ্চার করেছে। এদিক থেকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চ্চার প্রবর্ত্তক।

মাত্র চুয়ান্ন বৎসর আগে তিনি মারা যান, কিন্তু তার আগেই পৃথিবীর প্রাচ্যবিদ্যা মহাবথীরা তাঁকে একবাক্যে প্রধান পুরাতাত্ত্বিক বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। আমাদের একালের প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল প্রথম ও প্রধান গুরু।

শুঁড়ার সম্ভ্রান্ত এক কায়স্থবংশে রাজেন্দ্রলাল জন্ম গ্রহণ করেন; পুরুষানুক্রমে তাঁরা ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও পদস্থ।

কলকাতার উপকণ্ঠে শুঁড়ার এই মিত্র বংশকে বড়িশা বা কোন্নগরের মিত্রবংশও বলে। কোন্নগর শাখাই কালক্রমে ক'লকাতার গোবিন্দপুরে এসে বাস করে ও পবে উঠে মেছুয়া-বাজারে যায়, শেষে মেছুয়াবাজার ছেড়ে শুঁড়ার বাগান বাড়িতে বাস করতে থাকে। এখনও রাজেন্দ্রলালের বংশধরেরা এই বাড়িতেই বাস করছেন।

রাজেন্দ্রলালের পূর্ব্বপুরুষ রামরাম মিত্র ও তাঁর পুত্র অযোধ্যারাম মিত্র মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। অযোধ্যারাম মিত্র নবাব সরকার থেকে রায় (রাজা?) বাহাদুর উপাধি পান। তাঁর পৌত্র পীতাম্বর মিত্র দিল্লী দরবাবে অযোধ্যার নবাব-উজীরের উকীল ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে ৩০০০ (মতান্তরে ৩০০) সৈন্যের মনসবদারী, দোয়াবের অন্তর্গত কোড়া প্রদেশ জায়গীর ও রাজা বাহাদুর খেতাব দেন। কাশীর রাজা চৈত সিংহের বিদ্রোহেব সময় যখন রামনগর দুর্গ জয় হয় তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লুটের মধ্যে কতকগুলি পার্শি ও সংস্কৃত পুঁথি পান। এই পুঁথিগুলি ও অযোধ্যার নবাবের কাছে বাকী পাওনা ৯ লক্ষ টাকা নিয়ে তিনি ১৭৮৭ সালে কলকাতায় ফেরেন। এখানে এসে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও নিরিবিলিতে ধর্ম্মচর্চ্চা করার জন্য মেছুয়াবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শুঁড়ার বাগানবাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন। তিনি কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। ১৮০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পীতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র মিতব্যয়ী ছিলেন না; তাঁর সময়ে অনেক পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়। মেছুযাবাজারের বাড়ি বিক্রী হয়। কোড়া জায়গীর ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় হস্তান্তরিত হয়। শেষ বয়সে তিনি কটকের কালেক্টারের দেওয়ান হন। তাঁর পুত্র জন্মেজয় মিত্র সংস্কৃত ও পার্শি ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন এবং নিজের ও পিতামহের পদগুলি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে "সঙ্গীত রসার্ণব" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ ছাড়াও তিনি দু'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ডাঃ গুলব্রেড নামে একজন বিদেশী পণ্ডিতের কাছে ইনি 'রসায়ন শাস্ত্র' অধ্যয়ন করেন। এঁর পূর্ব্বে কোনো বাঙালীর রসায়ন শাস্ত্র পড়বার কথা জানা যায় না।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র জন্মেজয় মিত্রের তৃতীয় পুত্র। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে গণ্ডগোল আছে। বিশ্বকোষ ইত্যাদি গ্রন্থে ১৮২৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আছে কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রাজেন্দ্রলালের নিজের হাতে লেখা একটি নোটবই আছে। তাতে তিনি যে তারিখ দিয়েছেন সে অনুসারে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। এই নোটবইয়ে তিনি জীবনের প্রথম ১৯ বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে,—

( ১ ) ১৮২৭ সালে ৫ বছর বয়সে তিনি বাংলা ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন।

( ২ ) ১৮২৯ সালে শ্রীদ্বারিকানাথ নন্দীর কাছে ইংরাজী পড়তে আরম্ভ করেন।

( ৩ ) ১৮৩১ সালে পাথুরিয়া ঘাটার শ্রীক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন।

( ৪ ) ১৮৩৩ সালে ঐ স্কুল ত্যাগ করেন।

( ৫ ) ১৮৩৪ সালে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে ভর্ত্তি হন।

( ৬ ) ১৮৩৬ সালে ঐ স্কুল ত্যাগ করেন ও প্লীহা আদি রোগে ভোগেন।

( ৭ ) ১৮৩৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন।

( ৮ ) ১৮৪১ সালের ১২ই মে কলেজের প্রধান সাহেবদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় তিনি কলেজ ত্যাগ করেন।

তাঁর কলেজ ত্যাগ সম্বন্ধে কোথাও কোথাও অন্য একটি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় রাজেন্দ্রলালকে নিজের খরচায় বিলাতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারী পড়াবার প্রস্তাব করেন। তাতে রাজেন্দ্রের পিতা এত চটে যান যে, তিনি কলেজ থেকে ছেলের নাম কাটিয়ে নেন। রাজেন্দ্রলালের নিজের লেখা নোট থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এই কাহিনী অমূলক। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব সত্য হতেও পারে।

মেডিকেল কলেজের তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। ব্র্যাশ্‌লি, গুডিভ্‌ ওসঘনেসী প্রভৃতি ডাক্তারেরা তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় তিনি বাড়িতে ক্যামেরন নামে এক সাহেবের কাছে ইংরাজী পড়তেন।

ডাক্তারী ছেড়ে রাজেন্দ্রলাল আইন পড়তে গেলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি কৃতকার্য্য হতে পারলেন না—নিজের দোষে নয়, ঘটনাচক্রে। এই ব্যাপারেরও দুটি বিবরণ আছে। একটির মতে তিনি আইনের পরীক্ষায় পাশ ক'রে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করবার কিংবা মুন্‌সেফী চাকৃরি নেবার অনুমতি পান। কিন্তু তিনি কোনটাই পছন্দ না ক'রে জজ্‌ হতে চান। জজিয়তীর জন্য পরীক্ষাও দেন কিন্তু পরীক্ষাপত্র হারিয়ে যাওয়ায় তাঁর জজ হওয়া হোলো-না। দ্বিতীয় বিবরণ অনুসারে তিনি আইন পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু উত্তর-পত্র হারিয়ে যাওয়াতে পাশ করতে পারেন নি। দ্বিতীয় বিবরণটিই সত্যি বলে মনে হয়।

যাই হোক, তাঁর আইনজীবন এইখানেই শেষ হোলো। কিন্তু তাই বলে তাঁর ডাক্তারী পড়া বা আইন পড়া একেবারে পণ্ড হয় নি। কারণ এই দুইটি বিদ্যার অনুশীলন তাঁর মনকে গবেষণার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করেছিল।

রাজেন্দ্রলাল দুবার বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ হয় ১৮৩৯ সালে ১৭ বৎসর বয়সে

নিমতলার দত্ত বংশের শ্রীধর্ম্মদাস দত্তের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীর সঙ্গে। বিবাহের পাঁচ বছর পরে ১৮৪৪ সালের ৩০শে আগষ্ট একটি মাত্র কন্যা রেখে তাঁর স্ত্রী মারা যান। মাতৃবিয়োগের আড়াই মাস পরে কন্যাটিও মারা যায়। ১৬ বছর পরে ১৮৬০ সালে ৩৮ বছর বয়সে তিনি ভবানীপুরের কালীধন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবন মোহিনীকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র হয়—রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল।

আইন পড়া ছেড়ে রাজেন্দ্রলাল প্রায় তিন চার বছর ভাষা চর্চ্চায় মন দেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত সবশুদ্ধ ১১টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন; যথা, ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, পার্শি, হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া ও বাংলা। এতগুলি ভাষার উপর দখল থাকাতে তাঁর গবেষণার কাজ অনেক সুগম হয়েছিল।

মেডিকেল কলেজে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন Sir William O'Shaughnessy. তিনিই আবার বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারিও ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ মত ১৮৪৬ সালের ৫ই নভেম্বর মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহ সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই থেকেই তাঁর চাকরী-জীবন সুরু হয়, তাঁর ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণারও গোড়াপত্তন হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করেন প্রায় দশ বছর। ১৮৫৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এই কাজে ইস্তফা দিয়ে মার্চ্চমাসে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ পদ স্বীকার করেন। জমিদারদের ৮ থেকে ১৪ বছরের নাবালক ছেলেদের এক জায়গায় রেখে শিক্ষা দেওয়া ছিল এই ইন্‌ষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য। ২৪ বছর পরে ১৮৮০ সালে ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌টি উঠে গেলে মাসিক ৫০০৲ বিশেষ পেন্‌সানে রাজেন্দ্রলাল অবসর গ্রহণ করেন। মোট তিনি ৩৪ বছর চাকরি করেছিলেন।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেই রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেরণা পান। সমস্ত জীবন তিনি এই কাজে নিয়োগ করেন। চাকরি ত্যাগের পরেও এই সমিতির সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর কোনদিন ঘোচেনি। তিনি সমিতির জার্নালে ও কার্য্যবিবরণীতে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ১৮৪৮ সালে জানুয়ারি সংখ্যা জার্নালে প্রকাশিত হয়। তারপর খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশী বিদেশী বহু সাময়িক পত্রিকায়, যথাঃ Journal of the Photographic Society of Bengal, The Calcutta Review, Mookerjee's Magazine, Transactions of the Anthropological Society of London ইত্যাদিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। Englishman, Daily News, Statesman, Phoenix, Citizen, Friend of India, Indian Field, Hindu Patriot প্রভৃতি এ দেশীয় সংবাদপত্রেও তাঁর লেখা বহু সমালোচনা, পত্র ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন, সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত পুস্তক, মানচিত্র ও পাণ্ডুলিপির তালিকা, পুরাতন জার্নালের বিষয় সূচী ও শতবার্ষিক ইতিহাস ইংরাজীতে রচনা করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন দেশী গ্রন্থাগারে যে সব সংস্কৃত হাতে লেখা পুঁথি আছে তার তালিকা প্রস্তুত করেন

ও এই সব পুঁথি উদ্ধার ও রক্ষাকল্পে কি কি প্রচেষ্টা হয়েছে তারও একটি রিপোর্ট লেখেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য তিনি যত পরিশ্রম করেছেন দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে আর কেউ ততখানি করেছেন কিনা সন্দেহ। এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সহঃসেক্রেটারির পদে ইস্তফা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাধারণ সদস্য ও ৪ মাস পরে জুন মাসে কাউন্সিলের সদস্য; ১৮৫৭ সালে সেক্রেটারি; ১৮৬১ সালে সহঃসভাপতি ও ১৮৮৫ সালে সভাপতি নির্ব্বাচিত করে। এই শেষ সম্মানটিকেই তিনি জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান মনে করতেন।

তার পাণ্ডিত্যের ও গবেষণার খ্যাতি বাংলাদেশ বা ভারতের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ রইল না। সমুদ্র পার হ'য়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানকার শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদেরা ক্রমশঃ তাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার স্বরু করলেন ও শেষ পর্য্যন্ত অনেকেই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। যাঁরা তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার, গার্সিন ডি ট্যাসি, ফুসে, মেয়ার ডেয়ার, ওয়েবার, বোথলিঙ্ক, গোল্ডস্মিডট্, এগলিং, জন মুইর, কাউএল, এডোয়ার্ড টমাস, ডাঃ হুইটলি, ডয়সেন, ডাঃ রথ, ব্রিঁয়া হজ্‌সন, ডাঃ বর্ন্‌ফ ও ডাঃ কীলহর্ণ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিদেশে তাঁর পাণ্ডিত্যের সমাদর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক বৈজ্ঞানিক সভাসমিতিও তাঁকে সাদরে সদস্য পদে বরণ করে। যে সব প্রতিষ্ঠানের তিনি সভ্য ( Hony. member, Corresponding member or Fellow ) ছিলেন তাদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া হোলো :—

(১) Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, (২) Imperial Academy of Sciences, Vienna, (৩) Italian Institute for the Advancement of Knowledge, (৪) Asiatic Society of Italy, (৫) German Oriental Society, (৬) American Oriental Society, (৭) Anthropological Society of Berlin, (৮) Royal Academy of Sciences, Hungary, (৯) Royal Society of Northern Antiquities, Copenhagen.

তা ছাড়া রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখারও তিনি সভ্য ছিলেন। ফ্রান্সের জাতীয় শিক্ষার বিভাগ তাঁকে Palm-leaf ও Diploma দিয়ে সম্মানিত করে। স্বদেশেও যে তিনি সম্মান পাননি তা নয়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৭৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে L. L. D. উপাধি, ১৮৭৭ সালে গভর্নমেণ্ট রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ সালে C. I. E. ও ১৮৮৮ সালে ( কোথাও কোথাও ১৮৮৪ আছে ) 'রাজা' উপাধি দেন। তিনি জমিদার রাজা ছিলেন না, পণ্ডিত রাজা ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষার সাহায্যে এই জ্ঞানপ্রসার সম্ভব নয়, তা তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর দৃঢ় মত ছিল যে, মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন জগতের জ্ঞান সম্পদকে দেশের আপামর সাধারণেব সম্পত্তি করতে পারা যাবে না। এই জন্য তিনি বাংলা ভাষার পরম সমর্থক ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

অজ্ঞ দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ছিল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ব্রত। তাই পুরাতাত্ত্বিকের পরেই রাজেন্দ্রলালের অন্য পরিচয় শিক্ষক রূপে। বাংলা ভাষাব সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার যে সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল তিনি সবগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটির তিনি বহু বৎসর সভাপতি ছিলেন, ১৮৫১ সালে স্থাপিত ভার্নাক্যুলার লিটারেচার কমিটি বা বাঙ্গলা সাহিত্য সমিতিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ক'লকাতায় "সারস্বত সমাজ" স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজের সম্পাদক, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সভ্য, বঙ্কিমচন্দ্র সহযোগী সভাপতি ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি হন। বাংলায় পরিভাষা বেঁধে দেওয়া এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রস্তুত করার আবশ্যকতা রাজেন্দ্রলাল ইতিপূর্ব্বেই বুঝেছিলেন ও ১৮৭৭ সালে ইংরাজীতে একটি পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছিলেন। সারস্বত সমাজ থেকে প্রথমে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রস্তুত করা স্থির হয়। পরিভাষার প্রথম খসড়া আগাগোড়া রাজেন্দ্রলালই তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সমাজের আর অধিবেশন না হওয়ায় আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সমাজের সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন।...সেই সভার আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্ত্তমান সাহিত্য পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই-একজন ব্যক্তির দ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।"

ভূগোল ও মানচিত্রের উপর রাজেন্দ্রলালের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি বাংলায় একখানি ভূগোল লিখেছিলেন। স্কুলে ব্যবহারের জন্য বাংলা অক্ষরে ছোট বড় নানা মানচিত্র ছাপিয়ে ছিলেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রতি জেলার মানচিত্র ও একখানি ভৌতিক মানচিত্র ( Physical Chart ) তিনি বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রলাল পথপ্রদর্শক। তাঁর পূর্ব্বে বাংলা অক্ষরে আর কেউ মানচিত্র প্রকাশ করেন নি। বাংলা মানচিত্র ছাড়া নাগ্‌রি ও ফার্শি অক্ষরে ভারতবর্ষের ও শুধু ফার্শি অক্ষরে এশিয়ার মানচিত্রও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

ভূগোল ছাড়া আরও ৭ খানি বই তিনি বাংলায় লিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর কোনোটিই তাঁর গবেষণামূলক বা সাহিত্যপদ-বাচ্য নয়। সবগুলিই স্কুল পাঠ্য, যেমন ব্যাকরণ প্রবেশ, পত্র কৌমুদী। দু'খানি বই,—শিবাজীর চরিত ও মেবারের রাজেতিবৃত্ত,—ইতিহাস সংক্রান্ত বটে কিন্তু মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। এই দু'খানি বাংলা সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। সাহিত্য না হ'লেও এই দুটি ছোট স্কুলপাঠ্য ইতিহাস তাঁর গভীর দেশপ্রেমের সাক্ষ্য দেয়।

আসলে বাংলা ভাষায় তাঁর সাহিত্যসেবা আত্মপ্রকাশ করে স্কুলপাঠ্য পুস্তক পুস্তিকার মধ্য দিয়ে নয়, দু'খানি সচিত্র মাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে। পত্রিকা দু'খানির নাম বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ। বিবিধার্থ সংগ্রহ বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। ১৮৫১—১৮৬১ সালের মধ্যে তার মোট ৭ খণ্ড প্রকাশিত হয়, মাঝে ৩ বছর বন্ধ ছিল। প্রথম ৬

খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল, শেষ খণ্ডের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাংলা সাহিত্য-সমিতির সাহায্যে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হ'ত।

বাংলা সাহিত্য-সমিতি ও ক'লকাতা টেক্‌সট্‌বুক সোসাইটি ১৮৬২ সালে মিলিত হ'য়ে এক নূতন সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রহস্য_সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। ১৮৬৩—১৮৭১ সালের মধ্যে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় এই পত্রিকাখানির ৬ খণ্ড প্রকাশিত হয়; মধ্যে ৩ বছর বন্ধ ছিল। পরে প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদনায় আরও দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়।

এই দু'টি মাসিকের বহু প্রবন্ধই রাজেন্দ্রলালের রচিত। কিন্তু লেখকের নাম না দিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় আজ জানবার উপায় নেই—কোন্‌গুলি রাজেন্দ্রলালের, কোন্‌গুলি অপরের। পত্রিকা দু'টিতে যে সব গ্রন্থ সমালোচনা থাকতো সে গুলি খুব উঁচু ধরনের। বাংলা সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের আর কোনো দাবী থাক আর নাই থাক, প্রকৃত সমালোচনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তক হিসাবে তাঁর দাবী চিরকাল স্বীকৃত হবে।

বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব্বে রাজেন্দ্রলাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সভার সভ্য ছিলেন। ৫ জন সভ্য নিয়ে এই সভা গঠিত হ'ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাকী ৪ জন সভ্যের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এই পত্রিকার জন্য রাজেন্দ্রলাল কোনো প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না।

রাজেন্দ্রলাল শুধু গবেষণা ও সাহিত্য চর্চ্চা নিয়েই জীবন কাটান নি। দশের ও দেশের সেবাও করেছেন সক্রিয় ভাবে। ১৮৬৩—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতার পৌরকার্য্য একটি কমিটির দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'ত। এই কমিটির সভ্যদের বলা হ'ত Justices of the Peace. রাজেন্দ্রলালও একজন Justice of the Peace ছিলেন। ১৮৭৬ সালে ক'লকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে রাজেন্দ্রলাল করদাতাদের ভোটে সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এই পৌরপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে এর প্রতিষ্ঠার দিন থেকে নিজের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁর যোগ ছিল। সমস্ত ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। রাজেন্দ্রলাল ৪ বছর এই সভার সহঃসভাপতি ও ৪ বছর সভাপতি ছিলেন। তিনি দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে নির্ভীক ভাবে লড়াই করতে কখনও পরাঙ্মুখ হতেন না। তিনি উক্ত এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে বলেছিলেন, "যারা কর্ত্তাদের অনুগ্রহ ও প্রসাদ, সম্মান ও পুরস্কার পাবার জন্য 'আপ্‌কেওয়াস্তে' ও 'জো হুকুম'দের অনুসরণ করে তারা দেশবাসীর স্বার্থ বলি দেয়। সমাজে উচ্চাসন পাবার তারা কোন মতেই যোগ্য নয়।" তিনি নিখিল ভারতীয় ঐক্য একান্ত কামনা করতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আর এক অধিবেশনে তিনি বলেন, "রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যা না হলেই নয়—তা হচ্ছে একতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের একতা ও সততার অভাবই আমাদের সাফল্যের পথের একমাত্র অন্তরায়। যাঁরাই দেশের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদেরই সর্ব্বপ্রথমে একতা ও সততা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা উচিত।" ১৮৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ক'লকাতার টাউন হলে হয়। এই অধিবেশনের

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাংলাদেশে তখন কৃতী মনস্বীর অভাব ছিল না। এত লোক থাকা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলালকে ঐ গৌরবময় পদে বরণ থেকে প্রমাণ হয় দেশবাসীর চক্ষে রাজেন্দ্রলালের আসন কত উঁচুতে ছিল।

এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ দেন,তাতে বলেন, "আমার জীবনের একটি স্বপ্ন ছিল যে আমার জাতির (race) বিক্ষিপ্ত অংশগুলি যেন একদিন একত্র হ'য়ে মিলিত হয়। স্বপ্ন ছিল যে আমরা যেন কেবল ব্যষ্টিরূপেই না থাকি, কোনোদিন না কোনোদিন যেন সংহত হ'য়ে জাতি (nation) রূপে বাঁচতে পারি। এই অধিবেশনে আমি সেই মিলনের সূত্রপাত দেখছি—এই কংগ্রেসের মধ্যে দেখছি ভারতের ভাগ্যে এক উজ্জলতর দিনের সূচনা।"

এখানে তাঁর মাত্র তিনটি অভিভাষণ থেকে উদ্ধৃতির অনুবাদ দেওয়া হোলো। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে আরো অনেক বক্তৃতা দেন। তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। ১৮৫৭ সালে Black Act উপলক্ষে ক'লকাতায় যে সভা হয় সেই সভায় রাজেন্দ্রলাল প্রথম প্রকাশ্য-বক্তৃতা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯২ সালে রাজা যোগেশ্বর মিত্র তাঁর বক্তৃতা-গুলি সংগ্রহ ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে অন্যান্য অভিভাষণের মধ্যে এইগুলি আছে :—রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভা, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভা, মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা, দেশী ভাষায় শিক্ষা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রশ্ন, হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জীর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন, ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা, ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক মণ্ডলীর রাষ্ট্র হতে পৃথক করণ, ডাঃ মণীন্দ্রলাল সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিভাগ, দুর্গাপূজার ছুটির প্রশ্ন, বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়, ডাঃ হর্নলীর নিয়োগ ও রোমক অক্ষর প্রবর্ত্তন, শিক্ষা কমিশন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল্, ইলবার্ট বিল, কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটিগুলির একীকরণ, ঘিয়ে ভেজাল, হিন্দু-বিবাহ প্রশ্ন, কুষ্ঠ রোগীদের পৃথক করণ। পরিশিষ্ট : এন্ট্রান্স পরীক্ষা কমিটির রিপোর্ট, সহবাস সম্মতি বিল। এসব থেকেও বুঝা যায় রাজেন্দ্রলালের প্রতিভা ও প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী, ব্যাপক ও প্রবল।

সবশুদ্ধ ৫০টি গ্রন্থ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সম্পাদন বা রচনা করেন। এই ৫০টি গ্রন্থ মোট ১২৮ খণ্ডে বিভক্ত। সমস্ত গ্রন্থের মোট পাতার সংখ্যা ৩৩,০৮৯। পঞ্চাশটি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৪২টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যথা, বাংলায় ৮, সংস্কৃতে ১৪ ও ইংরাজীতে ২০। তালিকা নিচে দেওয়া হোলো :—

বাংলা :

১। প্রাকৃত ভূগোল — ১৮৫৪ সাল

২। শিল্পীক দর্শন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুত করণের বিবরণ গ্রন্থ ( সচিত্র ) — ১৮৬০ "

৩। শিবাজীর চরিত — নভেম্বর, ১৮৬০ "

৪। মেবারের রাজেতিবৃত্ত — ১৮৬১ "

৫। ব্যাকরণ প্রবেশ — ১৮৬২ "

৬। সাধু নিয়েরসিস ক্ল্যাজেন্সিস-এর প্রার্থনা। বাংলায় ও সংস্কৃতে অনূদিত। — ১৮৬২ "

৭। পত্রকৌমুদী অর্থাৎ নাম পত্রাদি লেখনের উপদেশগ্রন্থ শ্রীযুক্ত অনারেবেল্ ওয়ান্টার স্কট্ সিটন কার তথা শ্রীরাজেন্দ্রলাল্ মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত　১৮৬৩ সাল
৮। অশৌচ ব্যবস্থা　১৮৭৩ „

সংস্কৃত :

১। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক　১৮৫৪ „
২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১—৩ খণ্ড　১৮৫৯, '৬২, '৯০ „
৩। প্রাকৃত ব্যাকরণ, ক্রমদীশ্বর কৃত
৪। তৈত্তিরীয় আরণ্যক　১৮৭১ „
৫। গোপথ ব্রাহ্মণ　১৮৭২ „
৬। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য　১৮৭২ „
৭। অগ্নিপুরাণ, ১—৩ খণ্ড　১৮৭৩, '৭৬, '৭৯ „
৮। ঐতরেয় আরণ্যক　১৮৭৬ „
৯। ললিত বিস্তর　১৮৭৭ „
১০। বায়ু পুরাণ, ১—২ খণ্ড　১৮৮০, '৮৬ „
১১। নীতিসার, কামন্দক কৃত　১৮৮৪ „
(এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রলাল সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার নেন)
১২। অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা　১৮৮৮ „
১৩। বৃহদ্দেবতা, শৌনক কৃত　১৮৯২ „
১৪। আথর্ব্বানোপনিষদ, ৯ খণ্ডে সম্পাদন করেন বলে উল্লেখ আছে কিন্তু গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় নি।

ইংরাজী :

1. A Descriptive Catalogue of Curiosities in the Museum of the Asiatic Society of Bengal.　1849
2. A Catalogue of Books and Maps in the Library of the Asiatic Society of Bengal.　1856
3. Index to vols. I to XXIV of the Journal of the Asiatic Society.　1856
4. A Translation of Chhandogya Upanishad　1862
5. Notices of Sanskrit Manuscripts, First Series,　1870-1888
6. Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh, prepared by C. Browning. Ed. by R. Mitra　1873-1878
7. The Antiquities of Orissa. 2 Vols.　1875-1880
8. A Report on Sanskrit Manuscripts in Native Libraries.　1875

9. An Introduction to the Lalit Vistara. 1877
10. A Scheme for the Rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India. 1877
11. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal. Pt. I, Grammar. 1877
12. Buddha Gaya, the Hermitage of Sakya Muni 1878
13. The Parsis of Bombay ; a lecture delivered in February 26, 1880, at a meeting of the Bethune Society, Calcutta. 1880
14. Report on the Operations carried on to the Close of the Official Year 1879—'80 for the Discovery and Preservation of Ancient Sanskrit Manuscripts in the Bengal Province. 1888
15. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of H. H. the Maharaja of Bikaner 1880
16. Indo-Aryans. Contribution towards the Elucidation of their Ancient and Medieval History. 2 vols. 1881
17. The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. 1882
18. Yoga Aphorisms of Patanjali with the Commentary of Bhoja Raja and English Translation. 1883
19. History of the Asiatic Society, in the Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883. 1885
20. A Translation of the Lalit Vistara. 1886

উল্লিখিত সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের প্রত্যেকটি রাজেন্দ্রলালের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল। কিন্তু বিশেষ ক'রে ৩টি গ্রন্থ—Antiquities of Orissa, Buddha Gaya ও Indo-Aryans—তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রথম ২টি গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাদের নাম থেকেই প্রকাশ। শুধু Indo-Aryans গ্রন্থটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সেইজন্য তার বিষয়সূচী এখানে উদ্ধৃত করা হ'লো :—১। ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি, ২। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের মূলনীতি, ৩। ভারতীয় ভাস্কর্য্য, ৪। প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার, ৫। প্রাচীন ভারতের গৃহসজ্জা, তৈজস, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, ঘোড়া ও রথ, ৬। প্রাচীন ভারতে গোমাংস, ৭। প্রাচীন ভারতে মদ্য, ৮। প্রাচীন ভারতে বনভোজন, ৯। প্রাচীন ভারতে সম্রাটাভিষেক, ১০। প্রাচীন ভারতে নরবলি, ১১। প্রাচীন ভারতে প্রেতকৃত্য,

১২। সংস্কৃত সাহিত্যিকদের কল্পিত গ্রীক্ ও যবনের অভিন্নত্ব, ১৩। বাংলার পাল্ ও সেন বংশ, ১৪। গাথা, উপভাষার বিশেষত্ব, ১৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষ্য, ১৬। হিন্দীভাষার উৎপত্তি ও উর্দ্দুর সঙ্গে সম্বন্ধ, ১৭। গোয়ালিয়র রাজগণের চিহ্নাবশেষ, ১৮। ধারের ভোজরাজা ও তাঁহার সমনাম, ১৯। অশোকের প্রথম জীবন, ২০। আদিম আর্য্য, ২১। সংস্কৃতলিপির উৎপত্তি।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে বোঝা শক্ত নয় যে রাজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীর একজন অদ্বিতীয় মনীষী ছিলেন। তিনি একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদিতে প্রগাঢ় পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, নাগরিক, বক্তা ও লেখক ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এ জাতীয় প্রতিভা নিয়ে আমাদের দেশে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। ৬৯ বৎসর বয়সে, ১৮৯১ সালে ২৬শে ( বিশ্বকোষে ভুলে ২৯শে আছে ) জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা রাজেন্দ্রলালের প্রতিভার উচ্চ সম্মান করেছেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি পূর্ব্বেই কিছু উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে আরও কিছু উদ্ধৃত হোলো। যাঁরা সম্পূর্ণ বক্তব্য জানতে চান তাঁরা কবির 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করবেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।…এ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কারো নহে।...কোনো একটি বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশী করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম।…এক একদিন…তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন, এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।…তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।…যোদ্ধবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি বিপৎজনক ছিল। মিউনিসিপ্যাল সভায়, সেনেট সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্য্যবান। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনও তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না।…বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পর দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোন সম্মান লাভ করেন নাই।"

আমরা আজ কবিকে সম্মান করছি। কবি যাঁকে এতখানি সম্মান করতেন তাঁকেও যেন সম্মান করতে না ভুলি। *

রাধারমণ মিত্র

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিশ্বকোষ, Encyclopoedia Britannica, Bengal under the Lieutenant-Governors, নাটেশান প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী ইত্যাদি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

# ক্যানিং ষ্ট্রীট

ভয়ঙ্কর দেখাল—সামনের পা দুটো তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াল ঘোড়াটা। দাঁতের ফাঁকে লোহার কাঁটাটা কড়্‌কড়্‌ ক'রে ওঠে কামড়ে। ছোট ছোট লোমে চিকণ বিপুল বুকটা নীচের দিকে থাকার স্বাভাবিক সংস্থান ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে কেমন অপ্রাকৃত দেখায়। হিংস্র নাল-বাঁধা ক্ষুর দুটো শূন্যে ভেসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর, খুব কদাচিৎ যা ঘটে, ডাকল ঘোড়াটা।

গাড়ীটা বেঁকে বেঁকে অনেকখানি পিছু হটে এসেছে। সামনের চাকা দুটো ঘুরে গেল বেকায়দায়। সেখান থেকে লম্বা সরু এক জোড়া ডাণ্ডার ফাঁকে আটকা পড়ে র'য়েছে ওটা। সেলাই করা গোল একটা চামড়ায় বাঁধা পড়েছে ঘাড়; উন্মত্ত লাল চোখ দুটো ঠুলীর নীচে। দাঁতের ফাঁকে অসহ্য লোহার কড়াটা লাগামের সঙ্গে বাঁধা। সেলাই করা বিশেষ আকৃতির—গোল, চেপ্‌টা; সেলাই না করা, চিম্‌সে—চামড়ার একগুঁয়ে গন্ধঃ ঘোড়াটা ডাকল আবার।

পেছনের একটা চাকা ঠেকেছে দালানের কোণায়। আর বেশী সরা চলবে না ওদিকে। পরিমিত টান দিয়ে লাগাম ধ'রে রইল জলিল। কোচ্‌ম্যানের বাক্সে বসে আছে অভ্যস্ত আরামে। প্রায় সাদা ভুরুর নীচে একজোড়া চোখ কতখানি তীক্ষ্ণ হয়েছে বোঝা যাবে না। বাঁ হাতে লাগামটা যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই ধ'রে রইল। ডান হাতে চাবুকটা কিছুতেই নেবে না। অস্বস্তিসূচক পা নাড়াতে পারত, তাও না।

টান পেয়ে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ ক'রে উঠল চামড়ার ফাঁস। গলার ঘণ্টি ঠুনঠুন্‌ ক'রে উঠল—মিঠে। ঘোড়াটা আবার এক ঝাঁকুনি দিয়েছে।

—হুঁশিয়ার জলিল! একজন সহিস্‌ তার নিজের ঘোড়াটার কাছে ছুটে গেল, মুখের কাছে লাগামটা ধ'রে ঠেলে দিতে চাইল পেছনে।

—হারামী আছে ঘোড়াটা। জলিলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লুঙ্গির খুটটা তুলে গুঁজল কোমরে।

খুলে নিয়ে যাও ঘোড়াটাকে, নয়ত এ-ও ক্ষেপ্‌বে—

—ঠিক বাত্‌। ইস্‌মাইল মির্জাইর পকেট থেকে দেশালাই বার ক'রে বিড়ি ধরাল। তারপর খুলতে লাগল ওর নিজের ঘোড়াটাকে।

—লে, শালা—লে, লে—দুরন্ত উৎসাহে একটা রোগা ঢেঙ্গা ছেলে কোত্থেকে এসে লাফাতে স্বরু করেছে, লে এবার!

খড়ম পায়ে খট্‌খট্‌ করতে করতে দোকানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল মুটকী চীনে মেয়েটা। সরু গলায় জিজ্ঞেস করলে—

ক্যা হুয়া?

—হুঁসিয়ার জলিল, ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে যেতে যেতে ইস্‌মাইল সাবধান ক'রে দিল, হট্‌ যাও, হট যাও—চাট মারবে ঘোড়া—

ছোট একটা ভীড় একটু আলগা হয়ে আবার ঘন হয়ে এল।

পাগলা ঘোড়াটা আবার এক ঝাঁকুনি দিয়েছে ;—মড়মড় ক'রে উঠল পেছনের চাকাটা। দালানের কোণ থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খসে পড়ল একচাপ প্ল্যাস্টার। ডান হাতে একবার চাবুকটা নিতে গিয়ে নিল না জলিল। বাঁ হাতে লাগামটার টানে একটু হয়ত তারতম্য ঘটল। শাদা ছুঁচলো দাড়িতে এতক্ষণে মনে হল একটা নিপুণ মনোযোগ কঠিন হ'য়ে রয়েছে।

আব্বাজান।

জলিলের চার বছরের ছেলে উঁচু উঁচু হাত তুলে বাপকে আদর জানাল,—আব্বাজান হামকো গাড়ীমে লে যাইয়েগা!

তারপর শান্ত দেখাল ঘোড়াটাকে। মুহূর্তপূর্বের উত্তেজনাটা মরে গেছে মনে হ'ল। ডান হাতে চাবুকটা নিতে গিয়ে নিল না জলিল।

আর কিছু হবে না—উৎসুক ভীড়টা ভেঙে চুরে ক্যানিং ষ্ট্রীটের স্বাভাবিক জনস্রোত হয়ে গেছে। চীনে মেয়েটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিল শরীর, কালো কুর্তাটা তুলে মোটা পেটের ওপর ছেলেটাকে চাপিয়ে মাই দেবে এবার।

মনিহারী দোকানে নতুন প্যাকিং বাক্স খোলা হচ্ছে। রোগা ছেলেটা শব্দ ক'রে শুঁকে নাকের ভেতর বাতাসটা টেনে নিল—সামনের রাস্তাটা প্যাক্-খোলা বিভিন্ন টয়লেটের গন্ধে এলোমেলো হয়ে গেছে।

শালা কেয়া খুশ্‌বা—এ হামিদ—সরু সরু দুই পায়ে কেমন একটা অস্বস্তি—লাফাতে স্বরু করল।

ওহে এ তালাটার দাম কতো?

দশ আনার মাল আট আনায়—দশ আনার মাল আট আনায়—দাগী গেঞ্জির স্তূপ থেকে একটা ছুঁড়ে দিল খরিদ্দারের ওপর।

এ কেয়া হ্যায়, টুটা হ্যায়!

যাও যাও বাবা হোগা নেই।

আপনি বাঙালী তাই আপনার কাছে আসি, এ পাড়ায়—বুঝতেই পারছেন। প্রতি গ্রোসে চার আনা আমার থাকবে, তাও যদি আপনি না দেন—

ব্যবসাদারী অবহেলায় মোড়কগুলো ওলটাল—নোতুন. কোম্পানী আপনাদের। মাল চালু হোক বাজারে—তারপর—

চালু হবে মানে? লড়াইয়ের বাজারে—?

দশ আনার মাল আট আনায়, দশ আনার মাল—

পুরনো তালার ওপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে বলল—লোহার দর কি আর কমবে না?

নেহি নেহি বাবু, ও দরভি নেহি কমবে, আপ তালাভি নেহি লিবে—

ক্যানিং ষ্ট্রীটের জনস্রোত আরো এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। সেইখানে, জমাট মানুষের নীরেট লাইনের ভেতর রাবেয়ার মনটা উঁচু হয়ে উঠল—বাচ্চাটা! আভি ভুখসে কি করছে কে জানে!

বে-আব্রু মুখ রোদ্দুরে টকটক করছে। কপালের ওপর এক গোছা কালো বাদামী চুল লেপটে গেছে ঘামে। বাড়ী ফিরলে জলিল কি হুজ্জোতই যে করবে! গাড়ী নিয়ে এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে ওকে—শয়তানের চোখ আছে ওর কপালে।

ঘামে ভেজা মোটা মোটা দুই হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলছিল পাশের প্রৌঢ় মেয়েটা:

—এক দফে ব'লে দাও দেব—ব্যস্, দুনিয়াভর আদ্‌মী এসে পড়বে। বাপ্‌রে বাপ্, এত্‌না আদ্‌মী কাঁহাপর থা?—'হামকো দো', 'হামকো দো'—বাপ্‌রে বাপ্—

এপাশের গাঁয়ের মেয়েটি রাবেয়ার কাঁধে ভীতু হাত রেখে শুধাল: এলুমিনির বাসন দেবে বল্‌লে, তাই কামালপুর থেকে আসছি ছুটে। সেই ভোর হ'তে দাঁড়িয়ে রইছি, কই গো? কখন দেবে?

—দেবে যখন মর্জি হবে।

রাবেয়ার গলার স্বরে এখনও কিছু তাজা আমেজ রয়েছে। কষ্ট? রোদ্দুরে, ভীড়ে, ঠেলাঠেলিতে লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট? হোক। সখের জন্য কষ্ট সহ্য করবে না মেয়েমানুষ? সখই বা বলা যায় কেমন ক'রে। বাচ্চাটা কি বড়ো হয়ে উঠছে না? তিনজন আদ্‌মীর খানা পাকানোর কোনো বর্তন আছে ঘরে! জলিলের কি, হঠাৎ এক সময় বাড়ী এসে বলবে, খানা লাও; না আনলে—? ঘোড়া চালিয়ে চালিয়ে ওর মনটাই হ'য়ে গেছে ঘোড়ার মত।

প্রৌঢ় মেয়েরা বলছিল—দেখো দুনিয়াকা আদ্‌মীর হাল দেখো। ঘেয়ো কুত্তার উপর এত মাছি কখনও বসে?—হাত ঝাঁকাল; রোদ্দুরে বালা দুটো ঝক্‌মক্ ক'রে উঠল না, খোদাই করা নক্সার কালো কালো ময়লায় কটু দেখাল শুধু।

—আরে বাবা—এত্‌না মাল নেহি উস্‌কি দুকানমে। দো-চারজন ব্যস্—লাইন খতম্—

ভিড়ের ভেতর হঠাৎ ক্যানিং ষ্ট্রীটের অন্যরকম শব্দ ঠাহর করা যায়:

দশ আনার মাল আট আনায়, দশ আনার মাল আট আনায়—

খবরদার, খবরদার, ঠেলাওয়ালা ফিরছে অন্য লোকের মাল বয়ে।

সখ? জলিল তো বলবেই। জলিলের খাটো কুর্তাটার পকেট থেকে তিনটে টাকা বার ক'রে নিয়েছে রাবেয়া। রাবেয়া নেবে না? ইস্, বললেই হ'ল। মালিককে পাওনা জমার টাকাটা বুঝিয়ে দিতে হবে? তিনক্ষেপ সওয়ারী নিও, কলকাতার ব্যবসায়ীদের কাছে পাহাড়ি রঙীন পাথর বেচে মন খুসী থাকবে ভূটানীদের—বখশিস চেয়ে নিও—তিনটে টাকা রোজগার করতে কত সময় লাগবে জলিলের? দূর থেকে ময়লা নোট তিনটে জলিলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলেছিল—একঠো চীজ্ খরিদ করব। চীজ্—মানে এলুমিনিয়মের বাসন। তোমায় নতুন বাসনে আলুগোস্ পাকিয়ে দেব, তাড়ির সঙ্গে জমবে। কে যাবে কিনতে?—জলিল জিজ্ঞেস করেছিল। কেন? রাবেয়াই যাবে। মেয়েদের জন্যে আলাদা লাইন হ'চ্ছে, জলিল তা জানে না? তেরে আব্বাজান নে বুদ্ধু হ্যায়?—চার বছরের ছেলেকে আদর করেছিল রাবেয়া। কিন্তু অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেছে জলিল। মুসলমান বিবি বাইরে যাবে, একটা বোরখা অন্তত চাই। বোরখা? কেন, ছমাস আগে থেকে জলিলকে কি রাবেয়া মনে

করিয়ে দেয়নি যে বোরখাটা ছিঁড়ে গেছে? ফালি ফালি ন্যাকড়াগুলো পর্যন্ত ঘরকন্নার হাজারো কাজে খাইয়ে দিয়েছে ও; এখন বললে কি হবে?

আফ্‌সোস্! দোকানগুলোয় একটুকরো কাপড় নাকি ছিল না গরীব লোকের জন্যে।

উজ্‌বুক ঠেলাওয়ালাটাকে পাকড়েছে ঘোড়ায় চাপা এক পুলিশ—এ শালা উল্লু—

ট্রাফিকের আইন-কানুনগুলো ভীষণ গোলমেলে; এসব ক্ষেত্রে যা করা দরকার—ছুই হাত কচ্‌লিয়ে অনুকম্পা ভিক্ষে করল লোকটা।

পুলিশ ব্যারাকের মাদী ঘোড়াটা কিন্তু ইতিমধ্যে লড়াইয়ে ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গীতে ঠেলাওয়ালার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছে। তাজা বে-আব্রু ঘাড় উঁচু ক'রে তাকিয়ে দেখে ভয়ে শিটিয়ে গেল রাবেয়া।

—মা গো, মানুষটাকে মেরে ফেললে গো; গাঁয়ের মেয়েটি জাপ্‌টে ধরতে চাইল রাবেয়াকে।

ওদিকে হাঙ্গামায় রাস্তার একটা ভীড় মেয়েদের লাইনের ওপর ছিট্‌কিয়ে এসেছে। প্রৌঢ় মেয়েটা মোটা একজোড়া হাতে কীল তুলল:

আঁখসে সুঝতা নেই?—ইয়ে জানানা লোগোঁকি লাইন—কেয়া বেসরম মর্দানা—ভাগো ভাগো শালালোক—

মোটা বালা দিয়ে একজনের খুলিতে ঠুকেঠুকে বাড়ি মারল। বাসন কখন দেবে?

আব্বাজান, লে যাইয়ে গা হামকো গাড়ীমে?

কিছুক্ষণ শান্ত দেখিয়েছিল ঘোড়াটাকে। তারপর যথাযুক্ত টান ক'রে ধরা লাগামটায় প্রত্যাশিত ঝাঁকুনি খেল জলিল। পেছনকার ছুই পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা। প্লাস্টারের চাপ খসে গিয়ে একটা চাকা খোলা রাস্তা পেয়ে গেল। লাফাল ঘোড়াটা। সামনের বেকায়দা চাকা ছুটো সোজা দিকে ঘুরে গেছে।

আব্বাজান···তৃতীয়বার ছেলেটি তার কথা শেষ করতে পারল না। পাগলা ঘোড়ার খুরের চাপে-থেঁতলে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল পেটটা।

হুঁসিয়ার জলিল—সহিসটা আর্ত চীৎকার ক'রে ছুটে এল—একটু দেরী আগেই হয়ে গেছে।

হায়, হায়, হায়, ইসমাইল তার ঘোড়ার মুখে চানার থলিটা বাঁধতে বাঁধতে থমকাল—কেয়া কিয়া জলিল!

জলিল নড়ল না, আর্তনাদ করে উঠল না। পাগলা ঘোড়াটার শিরদাঁড়ায় অস্পষ্ট কম্পনের উদ্দেশ্য পড়ছে এখন। পাকা ভুরুর নীচে চোখ ছুটো জখম ছেলের দিকে চাইল না।

রোগা ঢেঙ্গা ছেলেটা ভীড়ের সঙ্গে এসে জুটেছে—কীসকো লেড়কারে তুম্? তারপর অভ্যাসবশে সরু সরু পা ছুটোয় একটা স্নায়বিক উদ্বেগ অনুভব করেছিল। পরের মুহূর্তে লাফাতে সুরু করত, হাততালি দিত—ইসমাইলের ধমকে থেমে গেল।

দেখনে কি কেয়া হ্যায়? কেয়া হ্যায় দেখনা?

এম্বুলেন্স—জলদি—

মনিহারী দোকানের মালিক দয়া ক'রে ফোন করবার ভার নিলেন—বেচারী !

উ লেড়কাকো ছোড় দিয়া কৌন ?

ঘোড়ার মুখে আলগা করে লাগানো দানার বস্তাটা খসে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ।

ছুটে যেতে হল ইসমাইলকে ।

কী আছে বাবা দেখবার ?

আ—হা !

খুন গিরতা বহুত্ ।

মোটা চীনে মেয়েটা একতাড়া ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে এসেছে—বাঁধো ওকে ? সহিসটা ইতস্তত করল ; ছেঁড়া মাংস আর রক্তের ভেতর হাত দেবার সাহস ওর নেই । চীনে মেয়েটা নিজেই এগিয়ে গেল ।

সহসা ছেলেটার জখম শরীর থেকে কেমন একটা অস্পষ্ট মোচড়ানো আর্তনাদ বেরিয়ে এল ; আর ক্ষেপে উঠল ইসমাইল—শালা হারামী আছে, শালা ঘোড়া খুনী, তোমকো জান নিকাল দেগা—

ক্ষেপে গিয়ে একটা ডাণ্ডা নিয়ে এল কোথা থেকে, ঘোড়াটার মুখের উপর মারতে স্বরু করল অন্ধ আক্রোশে—এক, দুই, তিন ।

খবরদার, কোচম্যানের বাক্স থেকে আদেশ বেজে উঠল জঙ্গী হাবিলদারের মত । এই প্রথম কথা বললে জলিল ।

তারপর ঘোড়াটা এক সময় শান্ত হল । কোচম্যানের বাক্সের শিকে নিপুণভাবে লাগামটা বাঁধল জলিল । নেমে এসে ঘোড়ার বাদামী পিঠে আদর ক'রে হাত বুলিয়ে ডাকল—জিভ্ আর দাঁতের ফাঁকে বাতাস চেপে মিষ্টি মিষ্টি শব্দ ক'রে । ঘোড়াটা চাট মারল না । ঘাড়ে নরম চাপড় মারল কয়েকটা । দাঁতের ফাঁকে লোহার কড়াটা কড়মড় ক'রে উঠল না । গাড়ীটাকে সরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় টেনে আনল । সিটের তল থেকে দানার বস্তাটা বার করে খেতে দিল ।

এতক্ষণে ছেলের কাছে এল ও । কি রকম মোটা মোটা কালো রঙের ন্যাকড়া দিয়ে ছেলেটাকে জড়ানো হয়েছে । ভেজা রক্তে কালো রঙটা ভয়াবহ । দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে নেওয়ার ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে চাইল জলিল । তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পিরানের বোতাম ছিঁড়ে ফেলল ও, রোদে পোড়া মুখের চেয়ে অনেক ফর্সা ধবধবে লোমশ বুকটাকে লাল করে তুলল চাপড় মেরে মেরে, ধিক্কারে ।

—মেরে বাচ্চা !

তখনও এম্বুলেন্স আসেনি ।

কেনা হল এলুমিনিয়মের ডেকৃচি । পাশের প্রৌঢ় মেয়েটা রাবেয়ার ডেকৃচিটা দেখে শুনে হিংস্‌টে হয়ে উঠল : দোকানদারটা বদ্‌মাস । রাবেয়ার খাপ্‌সুরত্ মুখ দেখে ভালো জিনিসটা দিয়েছে ওকেই । চকৃচকৃ করছে, পালিশ কী ! যেন চাঁদি । ডেকৃচির গায়ে রাবেয়ার মুখের ছায়া পড়েছে চেপ্টা হয়ে ।

সখের জিনিসটা শেষ পর্য্যন্ত কিনতে পারা গেল দেখে খুশী হয়েছে রাবেয়া । পৃথিবীটা

কেমন একধরনের ভালোই ঠেকছে, এত হৈ-চৈ গণ্ডগোল, ব্যবসা, ক্যানিং ষ্ট্রীট্—সব। বোরখার তল থেকে চুরি ক'রে দেখা পৃথিবীর চেয়ে পৃথক। ঠেলাঠেলিতে ঘামে, সরু সুর্মার টান মুছে স্থূল কলঙ্ক হয়ে গেছে যেখানে, ডাগর চোখের মনিটা সেই জায়গায় টেনে এনে তাকাল—ঐ রাস্তাটা কী?

—কলুটোলা।

অবাক হল;—আর ঐ রাস্তাটা?

—চীৎপুর।

বড়ো মস্‌জিদ; ভিখিরী; ফলওয়ালা; চীৎপুরের বাঁকা ট্রামলাইন, মাথায় রুমাল-বাঁধা জীপ-মেয়ে খবরের কাগজ কিনল; বেণীবাঁধা তিনটে ভুটানী; ভিস্তিওয়ালা;—দেখতে ভালোই লাগে।

মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল রাবেয়া। হাতের ডেকচিটায় কে যেন হঠাৎ এক টান দিয়েছে। তাকিয়ে দেখল কুৎসিত চেহারার এক ইরাণী মেয়ে।

—কেত্‌না দাম্‌ লেওগী, বোলো? ঘাঘরার ভাঁজ থেকে টাকায় ভরা মানিব্যাগ বার করল। বোলো—?

ব্যাপার কী! দুই হাতে ডেকচিটা আঁকড়ে ধ'রে পুরুষের-মত-দেখতে মেয়েটার দিকে চাইল রাবেয়া। কাঁচের চুড়িগুলোয় আতঙ্ক বেজে উঠছে।

য্যাদা দাম দেব, বেচবে না—?—তব্‌ যাও—রূঢ় ধাক্কা দিয়ে চলে গেল ইরাণীটা।

আর এতক্ষণে ভয় পেল রাবেয়া। মনে পড়ল, মুসলমানের বিবি, আব্রু না মেনে রাস্তায় একলা বেরিয়েছে। দোকানগুলোয় নাকি গরীবের বৌ-এর জন্য এক টুকরোও কাপড় নেই। ছেঁড়া শাড়ীটা সামলে নিযে দ্রুত পা চালাল।

চটের পর্দাটা ত্রস্ত হাতে সরিয়ে জলিলকে দেখতে পেল, খাটের ওপর বসে আছে স্তব্ধ হ'য়ে। কৈফিয়ৎটা সাজানোই ছিল—অনেক মেয়েই তো আজকাল বোরখা ছাড়াই রাস্তা হাঁটে; তবু ফ্যাকাশে গলায় মিথ্যে হাসি টেনে বাজে কথাটাই বলল আগে—রহিমকে আব্বা, তোম একেলা? মেরে বাচ্চা কাঁহা?

—হাসপাতাল।

জলিলের কথাটা কেমন কড়া শোনাল না কি? জলিল উঠে দাঁড়াচ্ছে কেন? শুকনো চামড়া, ঘোড়া আর বুড়ো মানুষের ঘামের একটা মিলিত ঝাঁঝালো গন্ধ এগিয়ে আসছে রাবেয়ার দিকে?

দুনিযার আদমী আজ রাবেয়ার বে-আব্রু মুখের দিকে তাকিয়েছে, দুনিয়ার আদমী দেখেছে জলিলের বৌ ছেঁড়া কাপড় প'রে দাঁড়িযেছিল রাস্তার লাইনে—পাগলা ঘোড়ার পিঠে যে চাবুক পড়েনি, সেই চাবুক পড়ল রাবেয়ার পিঠে, পায়ে, বুকে।—বারণ করেনি জলিল রাস্তায় ঐ ভাবে যেতে?

—কভি নেই যাযুঙ্গী, মেরে বাচ্চাকো ঘুমা দেও।

খাটিয়ার পায়া ধ'রে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদল রাবেয়া।

সন্ধ্যা নামল; তারপর রাত্রি। কলুটোলা, ক্যানিং ষ্ট্রীটের রাস্তাটা কেমন অস্বাভাবিক

নির্জন। পুরনো তালার বাক্স গুটিয়ে চলে গেছে তালাওয়ালা; গেঞ্জীওয়ালা; ইরাণী। গলার শিরা ফুলিয়ে ফুলিয়ে যারা সারাদিন চীৎকার করেছে; ছেলেপিলে সংসারের জন্যে রোজগার করেছে; ঘা খেয়েছে, ঘা মেরেছে। বোবা-বাঁকা আবেগের আঁকিবুকি হয়ত কালো দাগ রেখে গেছে খোলা রাস্তায়। সেখানে ঠুলিপরা গ্যাসের আলো প্রেত-সবুজ। মরা জানোয়ারের চোখের মত। দূরে, ঝাঁকার মধ্যে শরীর গুটিয়ে ঘুমন্ত কুলী। ব্যাফল্ ওয়ালের পেছনে ভিনদেশী মেয়ে পুরুষ। দুর্বোধ্য রাস্তাটায় একটা ভুতুড়ে কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কাছেই কোথাও আস্তাবল র'য়েছে, তারই বোটকা গন্ধ ভেসে আসছে, মিশে যাচ্ছে প্যাক্-খোলা টয়লেটের হাওয়ায়। জলিলের অন্ধকার গাড়ীটার টিনের ছাতের ওপর হিম জমছে। লেজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে ঘোড়াটা, তখন চামড়ার টানে একটা ক্যাঁচ্ কেচে শব্দ ঠাওর করা যাবে।

টল্‌তে টল্‌তে আসছে ওরা দুজন। ইস্‌মাইলের পা দুটো কিছুতেই খাড়া থাকছে না, বিশ্রী ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। যে দিলদরিয়া লোকটা তাকে এমন অযাচিত মদ খাইয়ে আনল তার সঙ্গে খুব, খুব মিষ্টি ব্যবহার করার ইচ্ছে হচ্ছে ওর। তোষামদের মতো কয়েকটা কথা বলার ঝোঁক চাপছে।

—আল্লার কসম্ জলিল, তোমায় আমি সর্দার ব'লে ডাকব।

জলিলের মাথাটা একটু বুকের উপর নুয়ে এসেছে। একটু বেশী ফুলো দেখাচ্ছে পেটটা। হাতের চাবুকটা দিয়ে হাঁটুর ওপর মাঝে মাঝে বাড়ি মারছে ও:

—মালিককে কাল পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। বদ্‌মাস বৌটা তিন রূপেয়া খরচ ক'রে ফেলেছে।

থুথু ফেলল ইসমাইল—কুত্তা, বিলকুল কুত্তা আছে আমাদের মালিক—হাঁটুর ওপর চাবুকের বাড়ি মারতে মারতে জলিল থামল একটু। খুব জরুরী কি একটা জিনিস বলবে ভাবছিল মনে আসছে না—

—বোরখা ছাড়াই রাস্তা হাঁকড়ে বেড়াচ্ছে বৌটা।

কঠিন জান আছে তোমার সর্দার—মাতাল ইস্‌মাইল নিজের ঝোঁকেই ব'লে যাচ্ছিল—কিন্তু বিল্‌কুল্ হারামী আছে আমাদের মালিক—রূপেয়া, রূপেয়া চাই ওর—ব্যস্—

না—কিছুতেই মনে আসছে না জলিলের। ঘামে-ভেজা থম্‌থমে মুখের ওপর দিয়ে হাতটা চালিয়ে নিয়ে মাথার ছোট চুলের ভেতর খসখস করে চুলকাল খানিক—জরুরী, খুব জরুরী কি একটা জিনিস সে ভুলে যাচ্ছে—

আর উল্‌টে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল ইস্‌মাইল; মাতাল মানুষের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় অভ্যাসে চরম ঘৃণায় আবার থুথু ফেলল ও—

পাগ্‌লা ঘোড়ার তলে হারামীটাকে একদফে চট্‌কিয়ে দাও সর্দার। আল্লার কসম!

চীৎপুর রোড্ থেকে একটি ফুলবাবু ও প্রসাধনকটু একটি মেয়ে ইশারায় ডাকল ওদের। মাতাল হলেও এসব জিনিস ওরা বুঝতে পারে। কোচম্যানের বাক্সে উঠে বসল জলিল। গাড়ী যে ভাড়া হবে এখন।

ননী ভৌমিক

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের কালকে ইউরোপের মধ্যযুগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেখানে 'আলকেমী' কখন 'ক্রিষ্টিয়ান' ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয় নাই। কারণ, ধর্ম্মমণ্ডলী (Church) ইহার বিপক্ষে ছিল। পক্ষান্তরে ভারতে 'আলকেমী', 'তুকতাক্', বিভিন্ন প্রকারের ম্যাজিক ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের পরের সময় হইতে রাজপুতগণের উত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুগকে তান্ত্রিকদের কর্ম্মের যুগ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বৌদ্ধেরা যে প্রকারে তান্ত্রিক-মতকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেয়, ব্রাহ্মণেরাও তদ্রূপ তন্ত্রকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করে। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদের দেখাদেখি ব্রাহ্মণগণ এইরূপ করে; কারণ, ইহা শোষণ-নীতির সহায়ক ছিল। তন্ত্রের প্রভাব বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে বিশেষভাবে প্রতিফলিত রহিয়াছে। বর্ণাশ্রমীয় ধর্ম্মের পূজা, পাঠ প্রভৃতির মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে হিন্দুর জপতপ, পূজাপাঠ প্রভৃতির জন্য যে সব মন্ত্র সৃষ্ট হইতে লাগিল, এইরূপ অনুমিত হয় যে তাহা গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থান কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-পূর্ব্ব সময়-পর্য্যন্ত কালে বিরচিত হয়। এইগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখা যাইবে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু যে সব পূজা ও পাঠ করিয়া থাকেন তাহা সংস্কৃত সাহিত্যেরই নানা স্থান হইতে শ্লোকাদি একত্র সংগ্রহ করিয়া বিরচিত হইয়াছে। এই পূজা-পদ্ধতি রচনার সময় গঙ্গা পবিত্র নদী বলিয়া গণ্য হইয়াছে, মহাকাব্যের বীরদের মধ্যে কেহ কেহ সমগ্র জাতির সম্মানার্হ হইয়াছেন (ভীষ্মতর্পন, রামনবমী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি), ব্রাহ্মণের সন্ধ্যোপাসণাবিধিতে বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতি রহিয়াছে। পৌরাণিক দেবতাগণ (ব্রহ্মা, গণেশ, শিব) পূজা পাইতেছেন। মন্ত্রসমূহের কতকাংশ বৈদিক সূক্ত, আর কতকাংশ তন্ত্র হইতে আহরিত ও গৃহীত। ইন্দ্রের যে-ধ্যানমন্ত্র পুরোহিতগণের পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে "চতুর্দন্ত গজারূঢ়ো বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ। শচীপতিশ্চ ধ্যাতব্যো নানাভরণ ভূষিতঃ" (৭) রূপবর্ণনা আছে। কিন্তু ইহা বৈদিক বর্ণনার সহিত মিলে না। পুনঃ 'ঘট পূজা'র সহিত 'মূর্ত্তিপূজা'র উদ্ভব হয় (কেহ কেহ বলেন, ইহা বৌদ্ধদের অনুকরণ), তুলসী বৃক্ষ পবিত্র ও দেবমূর্ত্তিরূপে গণ্য হইয়াছে। ইহা আবার "গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্য কারিনীং। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণু ভক্তিং প্রদায়িনীম্।" হইয়াছেন (৮)। পূজার মধ্যে 'শালগ্রাম শিলা' পূজা প্রবিষ্ট হইয়াছে (কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ স্তূপের নকল বলেন); পূজায় পশুবধ আর বৈদিক বিধিমত হয় না, তান্ত্রিক বলিদান বিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং নানা প্রকার বীজমন্ত্রেরও সৃষ্টি হয়। 'দশকর্ম্ম' প্রভৃতি কর্ম্মে বৈদিক ও নূতন কর্ম্ম-পদ্ধতিসমূহ বিরচিত হয়। তান্ত্রিক পূজাসমূহেও বৈদিক ও তান্ত্রিক নূতন মন্ত্রসমূহ একত্রিত করিয়া পূজা-পদ্ধতি সৃষ্ট হয়। আজও একটা নূতন

(৭-৮) হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা—১ম ভাগ; পৃঃ ১০৩, ১২০।

পূজাপদ্ধতি সৃষ্টি করিবার কালে বৈদিক ও সেই পূজা অনুযায়ী মন্ত্রসমূহ বিরচিত হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, হিন্দুর সকল ক্রিয়াকাণ্ড কালোপযোগী করা হয়। এমন কি বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের পূজা পাঠের অনেকস্থলে একাদশ শতাব্দীর ভবদেব ভট্টের পাঠ-বিধি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ( ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর তাম্রলিপি দ্রষ্টব্য ) ( ৯ )। ইনি বাঙ্গলায় নূতন স্মৃতির বিধান প্রদান করেন ( ১০ )।

এইরূপে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে ধর্ম্মের ও সামাজিক ক্রিয়াসমূহের মন্ত্রাদি নূতনভাবে সঙ্কলিত হয় অথবা সৃষ্ট হয়। এইসব নূতন সম্প্রদায়ের প্রভাবও সমাজে প্রতিফলিত হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের অহিংসাবাদ ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; এমন কি পুরাণসমূহও সর্ব্ব-বর্ণের লোকের উৎপত্তি এক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্প্রদায় পূর্ব্বে "নারদীয় পঞ্চরাত্রি"র দল বলিয়া জৈন ও বৌদ্ধদের ন্যায় অপাংক্তেয় ছিল তাহা বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া "বৈষ্ণব" নামে পাংক্তেয় হয়। ইহাদের ধর্ম্মের প্রভাবে যেমন "বাবাজীর ডৌল"রূপ হিন্দুর বিবর্ত্তন হয়, তান্ত্রিক প্রভাবও তদ্রূপ অনেক ধর্ম্মের ও সামাজিক নূতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলি হিন্দুর মধ্যে সর্ব্বজনীন হয়—যেমন, বিবাহিতা নারীর সিঁথিতে সিন্দুর পরা ( ১১ )। বোধ হয় ইহা স্বামী-ভুলান ম্যাজিক হইতে উদ্ভূত )। পূর্ব্ব-ভারতেই এই প্রথা বিশেষ বলবৎ। বোধ হয়, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই; যখন ইহার বন্যা আসিল তখন এই প্রথাটি জাতিগত রীতির ( mores ) অন্তর্গত হইয়াছে। এই জন্যই সেইদিন পর্য্যন্ত এইস্থানের অনেক মুসলমান বিবাহিতা রমণী সধবার এই চিহ্ন মস্তকে বহন করিতেন, এবং এখনও কেহ কেহ তদ্রূপ করেন। তান্ত্রিকদের বীজমন্ত্র অনেকের কাছে একটা অদ্ভুত জিনিষ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা ইহুদিদের Cabalistic Signs, প্রাচীন দক্ষিণ আরবের Sabeans সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক অক্ষর ও গ্রীসের পিথাগোরীয় Numerals দ্বারা গঠিত সাঙ্কেতিক চিহ্নের ন্যায় একটা Mystic Force ( অজ্ঞেয় শক্তি ) রূপে গণ্য হয়। কিন্তু ইহার গুহ্য তত্ত্ব অনেক পণ্ডিতের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইতেছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে ( ১২ )! কেহ কেহ বলেন ইহা দ্বারা নাকি শিব ও-শক্তির নানা প্রকারের মিলনকে প্রাচীন ও অপ্রচলিত খরোষ্টি অক্ষরসমূহের সম্মিলনে রূপ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ইহাও লোককে ধাঁধা দিয়া বিমুগ্ধ করার একটি উপায় মাত্র। এইজন্য ইহা শোষণ-নীতির একটি প্রণালী মাত্র। বৌদ্ধদের 'ধরণী' পাঠ ও মন্ত্র দ্বারা লোককে বিমোহিত করা, অন্যান্য ধর্ম্মের পূজা প্রার্থনাতে 'মানা' শক্তিতে বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়। পুনঃ দুইটি ধর্ম্মসংক্রান্ত চিহ্ন হিন্দুদের দ্বারা পূজার সময়ে ব্যবহৃত হয়ঃ প্রথমটি হইতেছে, বিখ্যাত স্বস্তিক চিহ্ন; দ্বিতীয়টি হইতেছে, একটি ত্রিভূজের উপর আর একটি ত্রিভূজ—উল্টা ভাবে অঙ্কিত করা চিহ্ন ( inverted triangles )। ইহা তান্ত্রিকদের উপাস্য দেবতার মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। স্বস্তিক চিহ্ন প্রাচীন ককেসাস, ক্রীট্ প্রভৃতি দেশে, এমন কি ইহা জেরুসালেমে রোমানগণ ইহুদিদের যে প্রাচীন মন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলে উহার বহিঃগাত্রে ও মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসস্তূপ মধ্যে

(৯) হিন্দু-সৎকর্ম্ম মালা—৫ম ভাগ। পৃঃ ২৫।

(১০) Inscription of Bengal—Vol., III. Pp. 27—28.

(১১) তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন কবিরাজ শিরোমণি ৺শ্যামদাস বাচস্পতি লেখককে বলিয়াছিলেন যে তান্ত্রিক যুগেই এই প্রথার প্রচলন হয়।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় চিহ্নটি ( ১২ ক ) আজ পর্য্যন্ত ইহুদিদের ধর্ম্মচিহ্ন স্বরূপ সিনাগগের ( মন্দির ) গাত্রে অঙ্কিত করা হয়। এই চিহ্নটি আগ্রায় হুমায়ুনের সমাধি-বাড়ীর প্রাচীরগাত্রেও অঙ্কিত আছে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দুইটির তাৎপর্য্য কি ? এবং ইহাদের উৎপত্তি কি ও কোথায় এবং কখন হইতে ইহা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বস্তু।

এই সকল বিবর্ত্তনের গতি দেখিয়া অনুমিত হয়, প্রাচীন আর্য্যকৃষ্টি কি প্রকারে নানারূপে পল্লবিত হইয়া মধ্যযুগের ছাপ বহন করিয়া বর্ত্তমানের বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজে পরিণত হইয়াছে। এই অভিব্যক্তিতে সনাতনধারাও নাই এবং চিরন্তনও কিছুই নাই। মানব-সমাজের অনুকরণে যুগে যুগে দেব-সমাজ কল্পিত হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রমীয় সমাজে পুরোহিততন্ত্র স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ সম্বলিত এবং যুক্তিবিহীন কাল্পনিক আদর্শমূলক পুস্তকসমূহ লিখিয়া অপ্রাকৃত চতুর্ব্বর্ণের লোকদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মধ্যযুগেও সকল জাতির লোক যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইত, মৌর্য্য (১৩) ও গুপ্তযুগের (১৪) তাম্রলিপিতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদার লোকসমূহের নামোল্লেখ থাকিলেও ক্ষত্রিয় রাজনীতিক পট হইতে মৌর্য্যযুগের পূর্ব্ব হইতেই অপসৃত হইয়াছে। বৈশ্যদের একদল ব্যবসা করিতেছে এবং শ্রেণীসঙ্ঘ পরিচালনা করিতেছে। পুনঃ একই পেশার লোক বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন সঙ্ঘাধীন হইয়াছে। ফলে ইহারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। মান্দাসোরে আবিষ্কৃত সম্রাট কুমারগুপ্তের সময়ের একটি শিলা লিপিতে উল্লেখ আছেঃ "লাটদেশের রেশম ( পট্টময় বস্ত্র ) বয়নকারীরা দাসপুর নামক নগরে বাস করিতে আসে; ইহাদের একদল ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়; কেহ কেহ আবার অন্য পেশাও অবলম্বন করে, কেহ বা স্বীয় রেশম বয়ন কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে এবং অন্যেরা উচ্চাদর্শ প্রণোদিত হইয়া জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয় এবং আজও ইহাদের অনেকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শত্রু নিধন করে। এই প্রকারে শ্রেণী ( গিল্ড ) সর্ব্বতোভাবে উন্নতিলাভ করে" (১৪ক)। এই শিলালিপিই স্মৃতিসমূহের মতের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। একই পেশা ও সমাজের লোকই পরে কেহ ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করে, কেহ দৈবজ্ঞ হয়, কেহ বা পুরাতন তাঁত বৃত্তিই বহাল রাখে। পরে সকলে একত্রিত হইয়া তাহাদের সঙ্ঘকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করত রাজপ্রতিনিধি বুদ্ধ বর্ম্মণের শাসনকালে দাসপুর নগরে একটি সূর্য্যমন্দির স্থাপন করে। স্মৃতিসমূহে দাবী করা হয় যে বৈশ্যেরা কৃষিকর্ম্ম, গোপালন ও বাণিজ্য করিবে। কিন্তু বৈশ্য বংশীয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সোনপাতে (১৫) আবিষ্কৃত লিপিতে তাঁহার পিতা প্রভাকর বর্দ্ধনকে "সর্ব্ববর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপণ প্রবৃত্ত" বলা হইয়াছে! এইস্থলে বৈশ্য ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য করিতেছে!

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

(১২ ও১২ক) স্বামী শঙ্করানন্দের RigVedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. II, নামক পুস্তকের Forewardএ স্বামী প্রত্যজ্ঞাত্মনন্দ বলেন যে, "বীজমন্ত্র" হইতেছে Phonetic formula" পৃঃ- XXXV11I ; আর "যন্ত্র হইতে basic systems of scripts be traced," পৃঃ XXXIX.

(১৩) A. Cunningham—The Bhilsa Topes. Chap. XIX. No. 3 ; 8.

(১৪) C. I. I.—Vol. III. No. 28 ; (১৪ ক) ঐ No. 18.

(১৫) C. I. I.—Vol. III, No. 52.

# সংস্কৃতি-সংবাদ

## সরলাদেবী চৌধুরাণী

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। সরলা দেবী ছিলেন স্বর্ণকুমারীর কন্যা। ঠাকুর পরিবারের প্রতিভার উত্তরাধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল সংগীতে। তাঁর গান গাইবার ক্ষমতা যেমন ছিল তেমনি ছিল গান শিখাবার ক্ষমতা। অনেকের মতে সংগীত-শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর জুড়ি প্রায় কেউ ছিল না। সংগীত-রচয়িত্রী হিসাবেও তাঁর নাম স্মরণীয়। তাঁর রচিত একাধিক স্বদেশী গান যে-কোনো বাংলা বা হিন্দি সংকলনে স্থান পাবার দাবি রাখে। কেননা, এই দুই ভাষাতেও তাঁর ছিল সমান দখল। কংগ্রেসের সঙ্গে সরলা দেবীর বরাবরই ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ; তাঁর অনেক গান কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে বিশেষভাবে রচিত ও গীত হয়েছে। এইখানেও দেখা যায় উত্তরাধিকারের প্রভাব। কেননা, সরলা দেবীর পিতা জানকী ঘোষাল ছিলেন আদি যুগের প্রধান বাঙালী কংগ্রেস-কর্মীদের অন্যতম। বাংলার মাসিক পত্রিকার ইতিহাসে সরলা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য তৃতীয় পর্যায়ের 'ভারতী'র সম্পাদিকা হিসাবে।

সরলা দেবী পঞ্জাবের পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর পত্নী ছিলেন। জীবনের বহু বৎসর তাঁর কাটে লাহোরে স্বামী-গৃহে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ও সংগীতে তাঁর অনুরাগ বরাবরই ছিল অক্ষুণ্ণ। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রৌঢ় বয়সে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি বাংলার সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ বিশেষ একটি কৃতী সন্তানকে হারিয়েছে।

## পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের মৃত্যু হয়েছে সুপরিণত বয়সে। যাঁদের মহৎ ব্যক্তিত্ব বিগত যুগের ব্রাহ্ম সমাজকে উজ্জ্বল করেছিল সীতানাথ বাবু ছিলেন তাঁদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর জীবনে দেখা যায় জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বিরল সমন্বয়। সারা জীবন তিনি কাটান বেদান্ত চর্চায় ও বেদান্তের মহৎ বাণীর প্রচারে। ব্রাহ্ম সমাজের নিষ্ঠাবান আচার্য হ'য়েও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন নি। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ঔপনিষদিক সাধনারই বিকাশ। তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত উপনিষদ্‌গুলিতে তিনি তাঁর মূল্যবান দান রেখে গেছেন।

হিরণকুমার সান্যাল

## ব্যঙ্গচিত্রে শেইক্সপীয়র ও পঞ্চম হেন্‌রি

ষোড়শ—সপ্তদশ শতাব্দীর গ্লোব থিয়েটারে বসে শেইক্সপীয়রের নাটক অভিনয় দেখতে পেলে আজকের দর্শক কী-না দিতে রাজি হবেন? থ্যাকারে বলেছিলেন, "শেইক্সপীয়রের

জুতো বুরুস করে দেবার সুযোগ পেলে সর্বস্ব দিতে রাজি আছি।" জগতের সেরা নাট্যকারকে নিয়ে কৌতূহলের সীমা নেই। বেকন-শেইক্সপীরীয় সমস্যা বহুকাল ধামাচাপা পড়েছে—চিরকালের জন্য। "Second best bed" নিয়ে জেমস জয়েসের জল্পনা সাহিত্যিক কৌতূহলের নিদর্শন। বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। এখন নাট্যরসিক শেইক্সপীয়রকে নাট্যমঞ্চের শিল্পী হিসাবে দেখতে চান। তাঁকে "Ensky'd and sainted" করবার আগ্রহ স্তিমিত হয়েছে। এখন লোকে বলে—দেখাও, শেইক্সপীয়র কি ক'রে সেই সময়কার দর্শকদের মনোরঞ্জন করত। বলো, সেই সময়কার গ্লোব-ব্ল্যাকফ্রায়ার্সের নাট্যপ্রয়োগরীতির কথা। যুগের সৃষ্টি শেইক্সপীয়র কি করে যুগস্রষ্টা হ'ল তারই কাহিনী শোনাও।

"পঞ্চম হেনরী" নাটক চিত্রীকৃত করবার সময় দর্শকের সেই কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৬০০ সালে গ্লোব থিয়েটারে যেমনটি অভিনয় হ'ত, ১৯৪৫ সালের দর্শককে প্রয়োগ-কর্তা তারই ছবি দেখাতে চেয়েছেন। রঙ্গমঞ্চের বাঁধাবাঁধি ও বিধিনিষেধ কি ভাবে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করত, ছবির প্রথম কয়েক মিনিটে তাই ফুটে উঠেছে। পরে ঘটনাপ্রবাহ রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী থেকে গল্পের ধারাটিকে ব্যাপ্ত করেছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সেখানেও প্রকৃত দৃশ্যের উপর নির্ভর না ক'রে সাহায্য নেওয়া হয়েছে অনুকৃতির —সমসাময়িক চিত্র অবলম্বনে রচিত পশ্চাৎ-পটের।

ডিকেন্সের হাতে পড়লে "পঞ্চম হেনরী" নাটকের নাম হয়তো হ'তো "দুটি দেশের গল্প।" A Tale of Two Countries—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের গল্প। শেইক্সপীয়রের কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক ইংল্যাণ্ড। এ নাটকেও ইংল্যাণ্ডেরই জয়জয়কার। সেই ইংল্যাণ্ডের প্রতীক পঞ্চম হেনরী।

যে হেনরী ফলষ্টাফের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াত, সে হেনরী আর নেই। ফলষ্টাফেরও দিন ফুরিয়েছে। "আমি তোমাকে চিনি না—জানি না।" রাজার কর্তব্য বা রাজার কর্তব্য বলতে ইংলণ্ডের লোকে যা বুঝত সেই কঠিন দায়িত্ব হেনরীকে পালন করতে হবে। হেনরীর কি আর নেচে-কুঁদে বেড়াবার দিন আছে? ভগ্ন হৃদয়ে ফলষ্টাফ মরল। সঙ্গে নিয়ে গেল হেনরীর সব দায়িত্বহীনতা, সব ক্রীড়া-কৌতুক। হেনরী রাজা। তাকে এ্যাজিনকোর্টের যুদ্ধ জয় করতে হবে; ফ্রান্স জয় করতে হবে। শুধু রাজত্ব জয় ক'রে সে সন্তুষ্ট হবে নাকি? রাজকন্যা চাই না? চাই-ই তো। আছে ফ্রান্সের রাজকন্যা। দুধবরণ কন্যা—কেশ তার মেঘবরণ নাই হ'ল। ফ্রান্স-দুহিতা ইংরেজী নাই বা জানল। রাজনৈতিক বিবাহটা সেরে নেওয়া যাক তো। তারপর ইংরেজী শিখুক ফ্রান্সের মেয়ে। গোড়াপত্তনটা অবশ্য ফ্রান্সে বসেই শুরু হয়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে আর মাতৃ-ভাষায় ফ্রান্সের মেয়ে যা বলে, ইংলণ্ডের রাজার কানে তাই মধু ঢালে। যা বুঝতে না পারে, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য আছে পাকা মহিলা দোভাষী—পিউরিটান দোভাষী, যে সভাসদদের মুখে বেচাল বেফাঁস কথা শুনলে চেঁচিয়ে উঠে রাজকুমারীর কানে হাত দেয়। প্রেম নিবেদনের সময় দোভাষিণীর উপস্থিতিটা খুব মধুর না হ'লেও, উপায় কি? একে যে অপরের কথা বোঝে না। তাই স'য়ে থাকতে হবে।

বিয়ে হ'ল। রাজা রাণী সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-করণা করতে লাগল। শেইক্সপীয়রের কথাটি ফুরুল, নটে গাছটি মুড়ুল।

এখন শুনুন সূত্রধারের কথা। ফিরে আসুন গ্লোব রঙ্গমঞ্চে; রঙ্গালয়ের ওপর ছাদ নেই। অভিনয়ের মধ্যে বেশ এক পশলা জল হ'য়ে গেছে। সকলের কাপড় চোপড় ভিজে একশা। কিন্তু এত জমেছিল নাটক যে গ্লোবের একটিও দর্শক নড়ে নি। ঠায় ভিজেই দেখেছে। তার কারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাদের জাতীয় জীবনের যোগ ছিল। নাটক দেখতে দেখতে, তারা নাটকের চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করত। অথচ সে যুগে না ছিল দৃশ্যপটের কারিকুরি, না ছিল আলোর কেরামতি। তবে হ্যাঁ, ছিল কাব্যময়ী ভাষা। দৃশ্যপট যা করতে পারে না, সে ভাষা তাই করত। দর্শকের চোখের সামনে স্থান-কাল ফুটিয়ে তুলত। সে ভাষা চোখের পলকে দর্শককে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে নিয়ে যেত। আধুনিক মঞ্চসজ্জা-পদ্ধতির দৌলতে অভিনয়ে সূক্ষ্মতা বেড়েছে। আজকের অভিনেতা যা হাবভাবে প্রকাশ করে, সেকালের অভিনেতা তাই বলতো কবিতার সাহায্যে। শ'-গল্‌স্‌ওয়ার্দি যা বোঝাতে বড় বড় Stage direction দিয়েছেন, সে-কালের নাট্যকার তা-ই বোঝাতেন কাব্যে। সে-কালের দর্শকও তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। সে-কালের নাট্যকারেরও নীতি ছিল—আপরিতোষাৎ গণনাং; ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানং। শুধু "বিদুষা" নয়—সকলের পরিতোষ হওয়া চাই। তবেই না নাট্যসৃষ্টি সার্থক।

পরিমল চট্টোপাধ্যায়

## সঙ্গীত সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ২৬শে আগস্ট, রবিবার রাত্রে শেষ হয়েছে। এবার পাঁচদিন ধরে উৎসব চলে। উত্তর ভারতের বহু সুপ্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌দের সাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় এই উপলক্ষে সঙ্গীত রসিকেরা লাভ করেছেন। এবারও অবশ্য প্রবেশ দক্ষিণা কম ছিল না; তথাপি দর্শকের স্থান সঙ্কুলানও প্রেক্ষাগৃহে সম্ভব হয় নি। এরূপ সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সামান্য পরিচয়ও এবার দেওয়া সম্ভব নয়। সংস্কৃতির নানা বিভাগের দাবি এই কারণেও আমরা যথাযথ পূরণ করতে অসমর্থ হচ্ছি। আশা করি পাঠক তা বুঝে আমাদের মতই সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন।

# শারদীয়া সংখ্যা

**কার্তিক সংখ্যা পরিচয় শারদীয় সংখ্যা হবে**

এ সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হবে পৃষ্ঠার বাহুল্যে নয়, লেখার বৈশিষ্ট্যে।

বিশেষ আয়োজন থাকবে গল্প ও কবিতার।